প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

& SONS

মানসী প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিক
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রি

পুনরুক্তি

বহুদিন পূর্ব্বে যখন 'বিশুদাদা' লিখি, তখন লিখিয়াছিলাম, যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না, আবার চেষ্টা করিব। তাহার পর 'অভাগী' লিখিবার সময় সেই চেষ্টা করিতে গিয়াছিলাম,—পারি নাই। তখন বলিয়াছিলাম—বারবার তিনবার। এই আমার তৃতীয় বা শেষ প্রয়াস;—জীবন-সায়াহ্নে, অসুস্থ শরীরে যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমার শান্তি।—

দার্জ্জিলিং
১৯১৯

শ্রীজলধর সেন

যাঁহার স্নেহ-শীতল ছায়ায় বসিয়া, অসুস্থ

শরীরে **ঈশানী** লিখিয়াছি,

যাঁহার অনুগ্রহে **ঈশানী** জন-সমাজে প্রচারিত হইল,

সেই দয়ার সাগর বর্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

সার্ বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর

কে, সি, এস, আই; কে, সি, আই, ই; আই, ও, এম,

মহোদয়ের

করকমলে **ঈশানী** উৎসর্গ করিয়া

শান্তি লাভ করিলাম।

শ্রীজলধর সেন

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত !
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত !"

—রবীন্দ্রনাথ

ঈশানী

১

"বড় বৌ! ও বড় বৌ!"

রাত্রি প্রায় বারটা। গ্রাম নিস্তব্ধ। এত রাত্রে গ্রামের লোক সকলেই নিদ্রামগ্ন। বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকিতেছেন,—"বড় বৌ! ও বড় বৌ!"

সঙ্গী শীতল মাঝির হাতে একটা ক্যান্‌বিশের ব্যাগ। সে একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল,"বড় কর্ত্তা, ওঠেন; ছোট কর্ত্তা ডাকৃতেছেন যে। এমন ঘুমও ত দেখি নাই। ও বড় কর্ত্তা!"

"কাকা না কি?"

"হ্যাঁ মা, উঠে দুয়ার খোল।"

তাড়াতাড়ি একটী সতর বছরের মেয়ে দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল, "কাকা, এত রাত্রে এলে! আমরা মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আর এলে না। ও মা, ওঠো, কাকা এসেছেন যে!"

মা উঠিবার আগেই মেয়েটীর পিতা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গলা শুনিতে পাওয়া গেল; "হরি এলে! দুর্গা

দুর্গতি-নাশিনী মা !" তাহার পরই বড় কর্ত্তা খড়ম পায়ে বাহির হইয়া বলিলেন, "এত রাত হোলো যে! লক্ষ্মী, তোমার মাকে ডেকে দেও। গিন্নীর কা'ল থেকে জ্বর হয়েছে। এই একটু আগেই তোমার কথা বল্‌ছিলেন। দুদিনের মধ্যে ফিরে আস্‌বার কথা, পাঁচ দিন হয়ে গেল। উনি ত ভেবেই অস্থির।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আরও তিন চার যায়গা ঘুরে এলাম। কোথাও কোন সুবিধা করতে পারলাম না।"

"সে কথা এখন থাক, কাল সকালে শুন্‌বো। লক্ষ্মী, বৌমাকে ডেকে তোল। তাড়াতাড়ি যা হয় রান্না চড়িয়ে দিতে হবে ত! শীতল, বোস্ বাবা! এখানেই দুটো প্রসাদ পেয়ে যা।"

শীতল বলিল, "বড় কর্ত্তা, এত রাতে আর পেসাদ পেয়ে কাজ নেই। সন্ধে বেলা আমরা বাউসমারীর বাজার থেকে চিড়ে মুড়কী নিয়ে রাতের কাজ শেষ করে এসেছি।"

বড় গিন্নী তখন বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "শোন কথা, দুটো চিড়ে মুড়কী খেয়েই রাত কাটাতে হবে না কি? বোস্ শীতল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাছের ঝোল ভাত হয়ে যাবে। আজ তিন দিন পথের দিক চেয়ে বসে আছি। কর্ত্তা সুধুই রাগ করে বলেন, বোসে-বোসে কাজ নেই, অকারণ কষ্ট করতে কেন যাওয়া! যা ত মা লক্ষ্মী, তিনটে মাগুর মাছ জিয়োনো আছে, তাই কুটে দে গিয়ে। ঐ ছোটবৌ উঠেছে। যা ত ছোটবৌ! দুটো উনন জ্বেলে মাছের ঝোল ভাত নামিয়ে দে। ওরে শীতল, তোর ভাইপো নগা না সঙ্গে গিয়েছিল। সেই ছেলেমানুষটাকে

একলা নৌকোয় রেখে এলি এই নিশি-রাত্তিরে। যা যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়! তোর নৌকোর জিনিসপত্র চুরী করবার জন্যে আর এমন সময় কেউ আস্‌বে না। যা, শীগ্‌গির যা! তাকে ডেকে নিয়ে আয় গে!”

শীতল বলিল, “দেখ দেখি হ্যাংনমা! রাত দুপুর হয়ে গেল! এখন রাঁধ রে, খাও রে। রাত যে কাবার হয়ে যাবে! তাই ত ছোট কর্ত্তারে বলিছিলাম রাত্তিরে আর বাড়ীতে উঠে কাজ নেই। নৌকোতেই শুয়ে থাক। তা ত উনি শুন্‌লেন না। এখন থাক বসে আর দুই ঘড়ি!”

লক্ষ্মী বলিল,“শীতল-দা, অত দেরী হবে না, দুটো মাছের ঝোল ভাত, এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেবে যাবে। তুমি যাও, নগেনকে নিয়ে এসো গে! আর জিনিসপত্র যা নৌকোয় আছে, দুই জনে নিয়ে এসো।” এই বলিয়া লক্ষ্মী তাহার খুড়ীমার সাহায্যের জন্য রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বারান্দায় একখানি মাদুর পাতা ছিল; বড় কর্ত্তা বসিয়া বলিলেন, “শীতল, বাবা, এক ছিলুম তামাক সাজ্‌ত। ঐ—ঐখানে সব আছে।”

হরেকৃষ্ণ মাদুরের পাশেই শানের উপর বসিয়া বলিল, “দেখ বড় বৌ, গেলাম ত নবীনগরের চাটুয্যেদের উদ্দেশে। আরে রাম, ছেলে নয় ত একেবারে আব্‌গারীর দোকান। আর চেহারা, বুঝলে বড় বৌ, একেবারে সংক্রান্তি ঠাকুর! বাবা, অত গাঁজা-ভাং কি মানুষের সয়!”

বড় বৌ হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, তোমার পছন্দ হোল না, তাই বল। পরের ছেলের নিন্দে কেন?"

হরেকৃষ্ণ বলিল, "নিন্দের কাজ করলেই নিন্দে করতে হয়। বামুনের ছেলে; নবীনগরের চাটুয্যেরা যেমন-তেমন ঘর নয়; নাম করলে লোকে চেনে। তাদের ছেলে কি না—আরে রাম রাম!"

বড় বৌ বলিলেন, "তার পর, আর কোথায় গেলে, তাই বল। চাটুয্যেদের কথা ঐখানেই থাক।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "মজা শোন না বড় বৌ! ঐ ত ছেলে, দুটো বিয়ে হয়ে গেছে। বয়স আর কত—এই বাইশ তেইশ। বাড়ীর কর্ত্তা মোহিনী চাটুয্যে বল্লেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই, পাল্টী ঘর। তার পর বল্লেন, নগদ তিন হাজার টাকা দিতে হবে। ছেলের যে দুটো বিয়ে আগে দিয়েছেন, সেখানেও না কি ঐ রকমই পেয়েছেন। শোন দেখি কথা। ইচ্ছে হোল খুব দশ কথা শুনিয়ে দিই। একটু—"

তাঁহাকে বাধা দিয়া বড় বৌ বলিলেন, "কিছু বল নাই ত? এ তোমার অন্যায় ঠাকুরপো! তারা ছেলের বিয়ে দেবে, তুমি ছেলে কিন্‌বে। তাদের জিনিস, তারা যা ইচ্ছে তাই দর চাইবে, তুমি পার কিন্‌বে, না পার চুপ করে চলে আস্‌বে। কথা শোনাবে কেন?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আক্কেলটা কি, বল দেখি বড় বৌ! বলে কি না তিন হাজার টাকা! টাকা যেন গাছের ফল, পেড়ে নিলেই হোল। তবুও ঐ ত ছেলে।"

বড় কর্ত্তা এতক্ষণ শুনিতেছিলেন, কোন কথাই বলেন নাই।

এখন বলিলেন, "হরি, তোমাকে ত এ সব কথা আমি আগেই বলেছিলাম। তুমিই ত শুন্‌লে না। এখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ত ভেঙ্গে এলে। কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা করতে হোলে, পাল্‌টী ঘর খুঁজতে হোলে, আমার লক্ষ্মীর ভাগ্যে ঐ রকম বরই মিল্‌বে, আর অত টাকাই দিতে হবে। তা ব'লে আর উপায় কি! সেই জন্যই ত বলেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের অদৃষ্টে নাই! তুমিই তা বোঝ না ভাই!"

হরেকৃষ্ণ দাদার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তার পর শোন বড় বৌ, নবীনগর থেকে ত যাত্রা করলাম। একবার মনে হোলো, যাক্, আর কোথাও যাব না, বাড়ী ফিরেই যাই। তার পর ভেবে দেখ্‌লাম, এতদূরই যখন এসেছি, তখন আর একটু ঘুরে শতখালির সেই ছেলেটীরও সন্ধান নিয়ে যাই। শুনেছিলাম, গোপীগঞ্জ থেকে শতখালি এই ক্রোশ দেড়েক হবে। গোপীগঞ্জের ঘাটে যেতেই ত একবেলা গেল। গোপীগঞ্জের বাজারে ফলার করে, একলাই চল্‌লাম শতখালি। দেড়ক্রোশ বই ত নয়। শীতলকে বলে গেলাম, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। নগা সঙ্গে যেতে চাইল, তাকেও সঙ্গে নিলাম না। তার পর সেই রৌদ্রের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে-করে ত চল্‌তে লাগলাম। বাঁধা-রাস্তা ত নেই, মাঠ ভেঙ্গে পথ। আরে কিসের দেড় ক্রোশ—পথ আর শেষ হয় না। এদিকে বেলাও দেখি পড়ে যায়। বুঝ্‌লেন বড়দা, একেবারে পাকা পাঁচ ক্রোশ—এক রশিও কম নয়। আর পথ ত সেই মাঠ ভেঙ্গে, জমির আলের উপর দিয়ে। যাক্, সেই সাড়ে বারটার

সময় বেরিয়ে চারটার পর শতখালি গিয়ে উপস্থিত। গ্রাম খুব বড়; অনেক ব্রাহ্মণের বাস; অন্য জাতও আছে। গেলাম হরচন্দ্র চাটুয্যের বাড়ী। চাটুয্যে মশাই বাড়ী ছিলেন না; নিকটেই কোন্ গ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। বাড়ীতে অন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পরিচয় নিয়ে খুব আদর-যত্ন করলেন; পাশের বাড়ীরই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল; বাবা না কি কয়েকবার তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন; তিনিও আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। নাম বল্‌লেন হৃষীকেশ গাঙ্গুলী। তিনি বেগের গাঙ্গুলী বড়দা!"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "শতখালির হৃষী গাঙ্গুলীকে আমিও চিনি। বেশ লোক।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "তিনিও আপনার কথা বল্‌লেন। যাক্ একজন পরিচিত লোক পেয়ে মনে একটু সাহস হোল। তাঁকে সব কথা বল্‌লাম। তিনি খুব ভরসা দিলেন। হারু চাটুয্যের ছেলে ভাল, ফরিদপুরে এক উকিলের মুহুরী; পয়সা-কড়ি বেশ উপার্জ্জন করে। বয়স শুন্‌লাম সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। তিনটী বিবাহ করেছিল, দুটী মারা গিয়েছে, একটী বেঁচে আছে; সে বাপের বাড়ীতেই থাকে, শ্বশুরবাড়ী আসতে চায় না। সেই জন্য ছেলের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা। এই সব কথা শুনে আমার ত ভালই বোধ হোলো, বুঝলে বড় বৌ। সন্ধ্যার সময় হরচন্দ্র চাটুয্যে মশাই বাড়ী এলেন। সন্ধ্যার পর কথাবার্ত্তা হ'ল। চাটুয্যে মশাই বললেন যে, তাঁর ছেলে ত বিবাহ করতেই

রাজী নয়। অনেক বলা-কহায় তবে রাজী হয়েছে। তার পর বল্‌লেন যে, কুলীনের মেয়ে আর কয়টাই বা শ্বশুরের ঘর করতে পায়। আমার ভাইঝি যখন সেই দুর্লভ অধিকার পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তার যখন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা নেই, তখন দেনা-পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করতে হবে। কথা শুনেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এই বিশেষ বিবেচনাটা কি, জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বল্‌লেন, পাঁচটী হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই ছেলের বিবাহ দেবেন না। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করলাম; ব্রাহ্মণের একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ। তখন আর কি করি, এত রাত্রে পাঁচ ক্রোশ পথ ত আর হাঁটতে পারব না। হৃষী গাঙ্গুলী মহাশয় আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। চাটুয্যে মহাশয়ও তাঁর ওখানেই থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন; আমি তাতে সম্মত হ'লাম না। বাড়ীতে এসে গাঙ্গুলী মহাশয় বল্‌লেন 'শোন হরেকৃষ্ণ, ও বাড়ীতে ব'সে ছেলেটী সম্বন্ধে যা বলেছি, তা মিথ্যে নয়; কিন্তু একটী কথা বলি নাই। এ ছেলের সঙ্গে তোমার ভাইঝির বিয়ে দিও না। আমার খুব সন্দেহ হয়েছে যে, ছেলেটার কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ওদের সুমুখে ত সে কথা বলা যায় না, তাই তোমাকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। তোমাদের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়—আত্মীয়তা বল্‌লেই হয়। জেনে-শুনে এমন কাজ করতে কি করে বলি। আর, তার পর খাঁই ত দেখ্‌লে—পাঁচ হাজার টাকা।'

তখনই ও ছেলের চিন্তা ছেড়ে দিলাম। রাত্রিটা কাটিয়ে ভোর

বেলায় যাত্রা করে, দশটার সময় নৌকায় এলাম। তার পর আর কি,—আর কোথাও গেলাম না—একেবারে বাড়ী চলে এলাম।"

বড় বৌ বলিলেন, "বেশ করেছ ঠাকুরপো। লক্ষ্মীর অদৃষ্টে বিয়ে থাকে, হবে,—তুমি আর অমন করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িও না। এই আজ দুবছর কোথায় বা না গেলে বল দেখি। স্থধু কষ্টই সার হোলো।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন,"তাই ভাল করে ওকে বোঝাও বড় গিন্নি! ও আমার সব কথা শুন্‌বে, স্থধু লক্ষ্মীর বিয়ের কথাই শুনবে না। তাই দেশ-বিদেশ ঘুরে মরছে। এখন দেখ্‌লে ত ভাই; যদি পাল্‌টী ঘর মেলে, ত ভাল ছেলে মেলে না। যদি বা দুটোই মেলে, তা হলে যে টাকার দাবী করে, তা আমাদের বেচলেও হয় না। আমি কি সব দিক্ না দেখে-শুনেই চুপ করে আছি। এখন তুমিও ত দেখ্‌লে। তবে আর কি,—চুপ করে থাক।"

এই সময় শীতল ও নগা জিনিসপত্র লইয়া আসিল। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "বড় বৌ, সস্তা দেখ্‌লাম, তাই এক কলসী গুড় কিনে নিয়ে এলাম।"

বড় বৌ রহস্য করিয়া বলিলেন, "যা হোক, মিষ্টি-মুখ করবার ব্যবস্থা ত করে এসেছ। দেখ ঠাকুরপো, তুমি আর অমন করে দেশ-বিদেশ করে বেড়িও না। একে তোমরা মহা কুলীন, পাল্‌টী ঘর মেলে না; তার পর লক্ষ্মীকে যার-তার হাতেও দিতে পারবে না। তার পর আমাদের এই অবস্থা। আমরা অনেক পুণ্য, অনেক তপস্যা করেছিলাম, তাই তোমাদের ঘর করছি; নইলে কুলীনের

মেয়ে কয়জন স্বামীর ঘর করতে পায়। লক্ষ্মীর অদৃষ্টে নেই, তোমরা কি করবে বল। ও লক্ষ্মী, মা, তোদের কতদূর।”

লক্ষ্মী রান্নাঘর হইতেই বলিল, “আর দেরী নেই মা। শীতলদাকে খান দুই পাতা কেটে আন্‌তে বল।”

নগা বলিল, “পিসিমা, পাতা আমরা নৌকো থেকে নিয়ে এসেছি ; রাত্তিরে কি গাছের গায়ে হাত দিতে আছে।”

হরেকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বলিলেন, “লক্ষ্মী, জেলের ছেলের কাছে শাস্তরে ঠকে গেলি।”

লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “শাস্ত্রে আর ও-সব পাতা-কাটার পাঁতি নেই কাকা! ও সবই তোমাদের হাতে-গড়া।”

বড় কর্ত্তা বলিলেন, “হাতে-গড়া যে, সে ঠিক কথা ; কিন্তু ওর মানে আছে মা! শাস্ত্রই বল, আর দেশাচারই বল, অনেক চিন্তা করে, অনেক ভেবে তা দেশে প্রচলিত হয়েছে।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “এত রাত্রে আর শাস্ত্র-কথায় কাজ নেই, এখনই মেয়ে এসে তর্ক জুড়ে দেবে, রান্না-বাড়া বন্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী মা, শাস্ত্র কা’ল হবে, এখন শীগ্‌গির করে ভাত বেড়ে দে ; তোর কাকার যে সারাদিন পেটে অন্ন পড়ে নাই।”

রান্নাঘরের বারান্দায় আলো দেখিয়া ও পিঁড়ি পাতিবার শব্দ শুনিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, “ঠাকুরপো, দুটো যা হয় মুখে দেও।” এই বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “বড় বৌ, তোমার জ্বর, তুমি আর যাচ্ছ কেন? তুমি বোস।”

“সামান্য একটু জ্বর, তার জন্য কি হবে, চল।” এই

বলিয়া বড় বৌ রান্নাঘরের দিকে যাইতে-যাইতে বলিলেন, "শীতল, বাবা, এইখানে একটু জলছড়া দিয়ে, পাতা নিয়ে বোস। লক্ষ্মী, বাইরে একটা আলো যে দিতে হবে।"

শীতল বলিল, "আর আলো লাগ্‌বে না, এমন চাঁদের আলো রয়েছে।"

"না, না, তা কি হয়!" এই বলিয়া বড় বৌ শয়নঘরে ফিরিয়া গেলেন এবং ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ ছিল, তাই আনিয়া দিলেন।

হরেকৃষ্ণ রান্নাঘরের বারান্দায় আহার করিতে বসিলে ছোটবৌ বাহিরে শীতল ও নগার ভাত দিয়া গেলেন। বড়-বৌ বলিলেন, "শীতল, তাড়াতাড়িতে এত রাত্তিরে স্থুধু মাছের ঝোল, আর ভাত। তোমাদের বড় কষ্ট হোলো। তা দেখ, কা'ল তোমরা এসে প্রসাদ পেয়ে যেও। তোমার মেয়েকেও সঙ্গে করে এন, বুঝলে।"

শীতল বলিল, "মা-ঠাকরুণ, আপনাদেরই ত খাচ্চি। এই ত বেশ খাওয়া হোলো, কা'ল আবার কেন?"

"না, না, সে হবে না, কাল নিশ্চয়ই এস।"

নগা বলিল, "তা আস্‌ব বৈ কি! পিসিঠাকুরুণ, আর একটু ঝোল দেবে গো!"

লক্ষ্মী খানিকটা ঝোল ও মাছ দিয়া গেল। হরেকৃষ্ণ গল্প আরম্ভ করিতেই বড়কর্ত্তা বলিলেন, "হরি, আর না, শোওগে, তোমার অবশিষ্ট গল্প কা'ল শোনা যাবে।"

২

গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। সারা গ্রামখানি খানাতল্লাস করিলেও কাহারও অন্তঃপুরে যথেষ্ট পরিমাণে কাঞ্চন মিলিত না,—সকলেই গরীব। যাহাদের কিঞ্চিৎ জমিজমা আছে, তাহারা দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইতে পায়; আর যাহাদের সে সব কিছু নাই, তাহাদের কেমন করিয়া দিনপাত হয়, তাহা তাহারাই জানে; আর জানেন, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। গ্রামে সাত আট ঘর ব্রাহ্মণ আছেন—সকলেই কুলীন; সকলেরই অবস্থা সমান। অল্প দু'দশজন ব্রাহ্মণ কায়স্থ-সন্তান অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখিয়া, কেহ বা বিদেশে চাকুরী করিতেছে; কেহ বা বাড়ীতে বসিয়া অন্ন-ধ্বংস করিতেছে; আর যাহা করিতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা বেশ জানেন। সহরের বাবুদিগের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, এই অল্পসংখ্যক নিষ্কম্মা যুবক পাড়ায় আড্ডা দেয়, অবৈতনিক যাত্রা ও থিয়েটারের দল করে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে; আর যাহা করে, তাহা শুনিয়া কাজ নাই।

এ-হেন কাঞ্চনপুর গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের বাস। তাঁহাদের কিছু জমাজমি আছে, পঁচিশ ত্রিশ ঘর যজমান আছে;

তাহাতেই এক রকম গ্রাসাচ্ছাদন চলে। বড় কর্ত্তা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি আছে। কালেভদ্রে ব্যবস্থা-পাঁতি দিয়া কিঞ্চিৎ পাইয়াও থাকেন। ছোট কর্ত্তা হরেকৃষ্ণ জমিজমা দেখেন, ঘরগৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করেন। বাড়ীতে ছেলেপিলের মধ্যে বড়কর্ত্তার এক কন্যা লক্ষ্মী—বাপের আদরিণী, কাকার নয়নের মণি ও কাকীর ছায়াস্বরূপিনী, গৃহস্থের আনন্দদায়িনী, পাড়া-প্রতিবেশীর চক্ষে সত্যসত্যই লক্ষ্মীস্বরূপিনী। এমন সুরূপা, সুশীলা মেয়ে কৌলীন্যে আট ঘাটবাঁধা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দিন-দুনিয়ার মালিক বলিতে পারেন। অনেক পিতামাতা আদর করিয়া চক্ষুহীন সন্তানের পদ্মলোচন নামকরণ করিয়া থাকেন; অনেক মসীকৃষ্ণ পুরুষকে গোরাচাঁদ নামে অভিহিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু যাঁহারা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার লক্ষ্মী নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি,—লক্ষ্মী প্রকৃতই লক্ষ্মী; রূপেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী,—অদৃষ্টে কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিলাম। তাহা না হইলে এরূপ মেয়ে কি বাঙ্গালাদেশে রাঢ়ীশ্রেণীর বরেণ্য কুলীন-গৃহে জন্মগ্রহণ করে? তাহা না হইলে কি গরীব বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া, ফরিদপুর জেলার মধ্যে এই ক্ষুদ্র কাঞ্চনপুর পল্লীতে কৌলীন্যের বেড়া-জালের মধ্যে আটক পড়ে? তাহা না হইলে এত সাধের মেয়েকে বিবাহ দিতে না পারিয়া পিতা, খুড়া গভীর মনঃকষ্টে নিরাশ

হৃদয়ে ভবিতব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন ?

মনে উঠিতেছে বহুদিন পূর্ব্বের একটী শোচনীয় দৃশ্য। তখন এই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ লেখক কুড়ি-একুশ বৎসরের নবীন যুবক। এত দীর্ঘকালেও সে দৃশ্যের স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। সেই সময় ফরিদপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রামে একদিন একটী বিবাহ-সভায়—কথাটা ঠিক হইল না—কুমারী-বলিদান-সভায় দুর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত ছিলাম। একটী অশীতিপর বৃদ্ধ বরের আসনে উপবিষ্ট। আমি ত তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিতে পারিতাম; এবং বিশিষ্ট নাড়ী-জ্ঞানসম্পন্ন কবিরাজ মহাশয়ও আমার ব্যবস্থার ত্রুটী ধরিতে পারিতেন না। সেই বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কুমারী নাম ঘুচাইবার জন্য ৬০ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম বর্ষ বয়স্কা দশটী কি এগারটী কুমারীকে সভাস্থ করা হইয়াছে। বাদ্যভাণ্ড নাই, শঙ্খধ্বনি নাই—কেবল রমণী-কণ্ঠের গভীর আর্ত্তনাদে পল্লীর গগন-পবন আকুল হইতেছিল! এখনও—এতকাল পরেও—যখনই সেই দৃশ্যের কথা মনে হয়, তখনই সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সেই অস্থিচূর্ণকারী হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাই! ভগবানকে প্রণাম করি, এখন এমন শোচনীয় কাণ্ডের কথা বড়-একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে একেবারেই এ কৌলীন্য লোপ পায় নাই;—লোপ পাইলে বর্ত্তমান কাহিনী লিখিবার প্রয়োজন হইত না। এক কথা বলিতে বসিয়া আর এক কথা আসিয়া

পড়িয়াছে,—গল্প লিখিবার 'আর্ট' না জানার এই প্রধান দোষ! যাক্, এখন বক্তব্য কাহিনীর অনুসরণ করা যাউক।

কাঞ্চনপুরে অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা যুবক ছিল। তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের কাহারও কাহারও কু-দৃষ্টি লক্ষ্মীর উপর পতিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখীন হইতে পারে নাই। সকলেই বুঝিয়াছিল, এ মেয়ের শরীরে হস্তার্পণ করা, বা তাহাকে কোনপ্রকারে লুব্ধ করা অসাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্মী গৃহকর্ম্ম করিত; অবসর সময়ে হয় পিতার নিকট বসিয়া শাস্ত্রের কথা শুনিত, পিতার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিত; কখনও বা মা ও কাকীর সহিত গল্প করিত; বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত কখনও বাড়ীর বাহির হইত না। বিবাহ সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাহার মনে কি হইত, তাহা ভগবানই জানেন; কিন্তু বাহিরে কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না। কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে যাহা অনেক সময়েই অপরিহার্য্য, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? তাহাকে চিরজীবন কুমারী অবস্থাতেই যাপন করিতে হইবে, এ কথা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার জীবন যে পিতামাতার সেবাতেই অতিবাহন করিতে হইবে, বিধাতা যে তাহার অদৃষ্টে দাম্পত্য-সুখভোগ লেখেন নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল,—গ্রামেও সে অনেক রমণীকে এই অনাদৃত জীবন অতি কষ্টে বহন করিতে দেখিয়াছে। বরঞ্চ তাহার সমশ্রেণীর

অন্যান্য কুমারীর অপেক্ষা সে ভালই আছে। বাড়ীতে কেহই ত তাহাকে অনাদর করে না—সেই যে বাড়ীর একমাত্র সন্তান—পিতা ও পিতৃব্যের বড় আদরের আদরিণী! তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য সকলেই সচেষ্ট। আর তাহার কুমারী-জীবন ঘুচাইবার জন্য পিতা, পিতৃব্য ত চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিয়া সে এই কুমারী-জীবনই বরণ করিয়া লইয়াছিল।

মানুষ যাহা ভাবে, মানুষ নিজের জীবন যে পথে পরিচালিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করে, তাহা যদি সফল হইত, তাহা হইলে পৃথিবীময় এত হাহাকার, এত আশা-ভঙ্গের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত না; এবং দীর্ঘশ্বাসে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইত না; এত কাতর আবেদন শুনিতে হইত না। আমরা মনে করি, ইহা করিব,—উহা করিব, কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের ভাগ্য-বিধাতা আমাদের জন্য যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে এক পদও স্বেচ্ছায় চলিবার যো নাই। আমি স্থির করিলাম, উত্তর দিকে যাইব, কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তিবলে আমার গতি পূর্ব্ববাহিনী হইল। আমি মনে করিলাম, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইব; কোথা হইতে নানা জঞ্জাল, নানা উপদ্রব আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। কোন দিনই ত আমরা নিজের ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারি না। আমরা ভাবি এক, হইয়া বসে আর এক। লক্ষ্মীর জীবনেও তাহাই হইল। সে মনে করিল, দূর

হউক, বিবাহের চিন্তা আর সে করিবে না, সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া পিতামাতার সেবা, সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে। যাহার প্রতিবিধান তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়, তাহার জন্য হা হুতাশ করিয়া সে জীবন অশান্তিময়, ভারাক্রান্ত করিবে না; কিন্তু ভাগ্য-নিয়ন্তা তাহার জন্য যে পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সে কেমন করিয়া অতিক্রম করিবে? সেখানে ত তাহার দৃষ্টি চলে না; ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাহার কথা ত কেহ তাহাকে বলিয়া দিতে পারে না;—এমন কেহ নাই, যিনি তাহাকে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে ত আর কথাই ছিল না। যে ভয়ানক বিপদ লক্ষ্মীকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহার সংবাদ কেহই তাহাকে দিতে পারে নাই,—মানুষের সে সাধ্য নাই।

প্রতিদিন যেমন রাত্রিতে গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া সকলে বিশ্রাম করেন, আজও তেমনি সকলে রাত্রি আটটার পরেই শয্যা গ্রহণ করিলেন। পল্লী অঞ্চলে সকাল সকালই সকলের বাড়ীরই কার্য্য শেষ হয়। রাত্রি ১০টার পরে অধিকাংশ পল্লীতেই জনমানবের সাড়া শব্দ থাকে না, সমস্ত গ্রামখানি নিদ্রার কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। শুধু জাগিয়া থাকে চোর, আর কুক্রিয়াসক্ত মানব-দেহধারী ইতর জীব।

সহরের বাড়ীঘর যেমন চারিদিকে আটকান থাকে, একটী কি দুইটী মাত্র প্রবেশ দ্বার থাকে,—সেই দ্বার বন্ধ করিয়া

দিলেই বাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে,—পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বাড়ী তেমন আঁটাসাঁটা প্রায়ই থাকে না। যাঁহারা সম্পন্নব্যক্তি, তাঁহাদের বাড়ীঘর প্রাচীর-বেষ্টিত থাকে, এবং তাহাতে প্রবেশ করাও সহজসাধ্য নহে; কিন্তু গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে সদর অন্দর থাকিলেও এদিক ওদিক দিয়া অনায়াসেই বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। গরীব গৃহস্থেরা এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও তেমন অনুভব করে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীও অনেকটা সেই রকম ছিল। বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ভিতরের প্রাঙ্গণে আসিতে হইলে একটা দ্বার অতিক্রম করিতে হইত; সেই দ্বার বন্ধ করিলেই যে অন্তঃপুর একেবারে আবদ্ধ হইত,তাহা নহে; আনাচ-কানাচ দিয়া অনায়াসেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা যাইত।

ভিতর বাড়ীতে তিনখানি শয়নের ঘর। তাহার একখানিতে ছোট কর্ত্তা হরেকৃষ্ণ সস্ত্রীক থাকিতেন; আর একখানিতে এক পার্শ্বে বড় কর্ত্তা শয়ন করিতেন, এবং দ্বিতীয় বিছানায় লক্ষ্মী মায়ের কাছে থাকিত। অপর ঘরখানিতে কেহ শয়ন করিত না; জিনিষ-পত্র থাকিত। রাত্রিতে সেখানি চাবিবন্ধ থাকিত।

ইতিমধ্যে এক দিন রাত্রি যখন এগারটা কি বারটা, তখন লক্ষ্মী বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে গেল; বড় গিন্নীর তখন নিদ্রার ঘোর, তবুও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মেয়ে বাহিরে গেল। সকলেই এমন ভাবে রাত্রিতে দুই একবার উঠিয়া থাকে।

প্রায় একঘণ্টা পরে বড় গিন্নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকারের

মধ্যেই শয্যাপার্শ্বে হাত দিয়া দেখেন, লক্ষ্মী নাই। তিনি তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, লক্ষ্মী অনেকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছে। দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা পড়িয়া আছে। তিনি তখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন; কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিলেন, ঘরের পশ্চাতে যাইয়াও দেখিলেন। বাড়ীর সংলগ্ন যে বাগান ছিল, সে দিকেও গেলেন; কিন্তু কোথাও লক্ষ্মীর সাড়াশব্দ পাইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মী হয় ত শৌচে গিয়াছে। পল্লীগ্রামে কাহারও বাড়ীতেই শৌচাগার বড়-একটা থাকে না; পুরুষেরা মাঠে যান, স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর নিকটে বাগানে বা জঙ্গলে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীর মা তাহাই মনে করিয়া বাগানের দিকে গিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি; চারিদিকই সমস্ত দেখা যাইতেছিল। তিনি যখন কোথাও লক্ষ্মীর সাড়া পাইলেন না, তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া ডাকিলেন, "ওগো, একবার ওঠ ত?"

এই অকস্মাৎ আহ্বানে বড় কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "কি? ডাকছ কেন?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "লক্ষ্মীকে যে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।"

"অ্যাঁ, বল কি? লক্ষ্মী? লক্ষ্মী কোথায় গেল? সে ত তোমার পাশেই শুয়ে ছিল।"

"আমার পাশেই শুয়ে ছিল। খানিকক্ষণ আগে সে উঠে

দুয়ার খুলে বাহিরে গেল; এমন ত গিয়াই থাকে। আমার চোখের উপর ঘুম চেপে এসেছে, আমি একটু যেন সাড়া পেলাম, তারপরই ঘুমিয়ে গিয়েছি। এখন হঠাৎ জেগে দেখি, মেয়ে ত বিছানায় নেই। কতক্ষণ হোলো সে যে বাহিরে গেছে, তাও ত ঠিক বল্‌তে পারছি নে। তুমি ওঠ, একবার দেখ, মেয়ে কোথায় গেল।”

বড় কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া এমন আড়ষ্ট হইয়া গেলেন যে, তখন কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; সুধু বলিলেন, “তাই ত!”

বড় গিন্নী বলিলেন, “তুমি আর এত রাত্রিতে কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় খোঁজ করবে। ঠাকুরপোকে ডেকে তুলি।” এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে বড় কর্ত্তা বলিলেন, “দেখ গিন্নি, চেঁচামেচি কোরো না; গোলমালে কাজ নেই। আস্তে আস্তে হরিকে ডেকে আন; তারপর পরামর্শ করা যাক্। তুমি সব দিক দেখেছ ত গিন্নি!”

বড় গিন্নী বলিলেন, “আমি সব জায়গা খুঁজে দেখে তারপর ত তোমাকে ডেকেছি।”

বড়কর্ত্তা বলিলেন, “তা হলে আর দেরী কোরো না; যাও হরিকে ডেকে আন। হা মা দুর্গে, এ কি করলে মা!”

৩

বড় গিন্নী হরেকৃষ্ণের ঘরের দাবায় উঠিয়া ধীরে-ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন, কথা বলিবার বা ডাকিবার সাহস তাঁহার হইল না।

ভিতর হইতে হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “কে ?”

বড় গিন্নী উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া হরেকৃষ্ণ নীরব হইলেন, মনে করিলেন তাঁহার ভ্রম হইয়াছে ; কিন্তু একটু পরেই আবার দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। হরেকৃষ্ণ তখন শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, বড় গিন্নী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

এত রাত্রিতে, এমন অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া হরেকৃষ্ণ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড় বৌ, তুমি এত রাত্রে ? কি—” তাঁহাকে আর কথা সমাপ্ত করিতে হইল না ; বড় গিন্নী কাঁদিয়া বলিলেন “ঠাকুরপো, লক্ষ্মী ?”

“লক্ষ্মী ! লক্ষ্মীর কি অসুখ করেছে ? তা, সেজন্যে তুমি এত ব্যস্ত হচ্চ কেন ? চল, দেখিগে কি অসুখ হোলে। এই ত সন্ধ্যার সময় সে বেশ ছিল, এরই মধ্যে কি হোলো।”

বড় গিন্নী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুরপো, সর্ব্বনাশ হয়েছে, লক্ষ্মী ঘরে নেই।"

"লক্ষ্মী ঘরে নেই, তুমি কি বলছ বড় বৌ? ঘরে নেই ত কোথায় গেল।"

"তা ত জানিনে ঠাকুরপো! একটু আগে হঠাৎ জেগে দেখি লক্ষ্মী আমার পাশে শুয়ে নেই; ঘরের দুয়ার খোলা পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে সব দিক খুঁজে দেখ্‌লাম, কোথাও তাকে পেলাম না। তাই তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। ঠাকুরপো, মেয়ে আমার কোথায় গেল?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "দাদা উঠেছেন, তিনি শুনেছেন?"

"তাঁকেই আগে ডেকেছি। তিনি তোমাকে ডাক্‌তে বল্‌লেন।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "চল, দাদার কাছে যাই। তুমি ত বাগানের দিক্‌টা ভাল করে দেখেছ বড় বৌ! পুকুরের ঘাটে গিয়েছিলে? মা আমার ত অভিমানে জলে ঝাঁপ দেয় নি।" এই বলিয়া তিনি যে ঘরে বড় কর্ত্তা ছিলেন. সেই ঘরে গেলেন। দেখিলেন, তাঁহার দাদা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

হরেকৃষ্ণকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "হরি, শুনেছ, লক্ষ্মীকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

হরেকৃষ্ণ সাহস দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না দাদা! বড় বৌ কি আর খুঁজতে পেরেছেন। লক্ষ্মী হয় ত বাগানের দিকে গেছে, এখনই আসবে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "না হরি, বড় গিন্নী যা বল্‌ছেন, তাতে মনে হয় লক্ষ্মী একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা আগে ঘর থেকে বেরিয়েছে। এতক্ষণ সে বাইরে থাকবে কেন—আর এই রাত্রিতে।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "হয় ত পুকুরে গিয়েছে। আমি পুকুরের দিকটা আর বাগানটা ভাল করে দেখে আসি।"

হরেকৃষ্ণ পুকুর বাগান প্রভৃতি স্থান অনুসন্ধান করিয়া দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কৈ না, কোথাও ত লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে পেলাম না, কোন চিহ্নও ত পেলাম না। এখন কি করা যায়?" হরেকৃষ্ণ হতাশভাবে ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

নীরব রজনী,—প্রকৃতি নীরব, গৃহের মধ্যে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নীরবে শয্যায় উপবিষ্ট,—ধরাসনে তাঁহার স্নেহময় কনিষ্ঠভ্রাতা নীরব, দ্বারের পার্শ্বে বসিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিনী বড় গিন্নী নীরব,—তাঁহার পার্শ্বে করুণাময়ী ছোটবধূ নীরব;—আকাশের চন্দ্রও নীরবে কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বাহিরে সকলেই নীরব; কিন্তু এই নিশীথ সময়ে এই কয়টি মানবের হৃদয়ের মধ্যে যে ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, তাহা যদি বাহির হইবার পথ পাইত, তাহা হইলে গ্রামের গগন-পবন সেই আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া যাইত। যাহার জন্য গভীর আর্ত্তনাদ—এই প্রাণঘাতী হাহাকার, কোথায় সে!

এই নীরব শোক-প্রবাহ হরেকৃষ্ণকে আকুল করিয়া তুলিল; তিনি অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কি হবে দাদা?"

রামকৃষ্ণের হৃদয় মথিত, পিষ্ট করিয়া শব্দ উঠিল, "কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ ভাই হরেকৃষ্ণ! আর কি হবে? কাল সকালে জানাজানি হবে, কাঞ্চনপুরের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুলত্যাগিনী হইয়াছে। আত্মীয়স্বজন, দশগ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে; কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হবে। আরও কি হবে, শুন্‌বে ভাই? এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে দেশে বাস করা অসম্ভব হবে। তোমাদের হাত ধরে আমার এই সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে দেশান্তরে,—যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, আমাদের পরিচয় জানে না,—সেইখানে চলে যেতে হবে। তারপর উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। আরও শুন্‌বে ভাই!—তার পরে ভগ্নহৃদয়ে তুমি আমি নরকে চলে যাব;—নরকেই যেতে হবে ভাই;—এমন কুলত্যাগিনী মেয়ের যে জন্মদাতা, নরক ছাড়া তার অন্য গতি নেই। তারপর ঐ দুটী হতভাগী বিধবা দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে জীবনপাত করবে। এমনই করে বংশ লোপ হয়ে যাবে। আর কি হবে?"

হরেকৃষ্ণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, দাদা, তা হতেই পারে না। আপনাকে বল্‌ছি, মা আমার কুলত্যাগিনী হয় নাই। এ কথা প্রাণ থাকতে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সে হতেই পারে না। লক্ষ্মী কুলত্যাগ করবে, লক্ষ্মী চলে যাবে, আমাদের কুলে কালী দেবে, এ হতেই পারে না। আপনি ভুল করছেন দাদা?"

"ভুল তা হলে ভেঙ্গে দাও ভাই! বল, সে ভট্টাচার্য্যদের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে; বল, তার মৃতদেহ পুকুরের জলে ভেসে উঠেছে। বল, সেই কথাই বল।"

"আমি তাই ভাবছি দাদা!"

"বেশ, তাই ভাব—তাই ভেবেই তোমার ভ্রান্ত মনকে প্রবোধ দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভাই, কি দুঃখে লক্ষ্মী, আমার বড় স্নেহের কন্যা লক্ষ্মী, তোমার আদরিণী লক্ষ্মী, মা-খুড়ীমার নয়নের মণি লক্ষ্মী, কোন দুঃখে আত্মহত্যা করবে?"

"কোন্ দুঃখে? কুলীনের মেয়ের জীবনই ত দুঃখের দাদা! লক্ষ্মী বাপমায়ের স্নেহ পেয়েছে, সংসারে তার খাওয়াপরার অভাব হয় নাই, স্নেহ ভালবাসার অভাব হয় নাই; কিন্তু এই কি নারীজীবনের সব। এরই জন্য কি ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার প্রাণ কি আর কিছুই চায় না দাদা? আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি পণ্ডিত। মেয়ের জীবনে কি আর সাধ-আহ্লাদ নেই? আর কি কোন বাসনা নেই?"

"আছে ভাই, আছে। সেই বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই সে বাপ-মায়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে না;—বংশ-গরিমার দিকে চাইল না। প্রবৃত্তি তাকে যে দিকে নিয়ে যেতে চাইল, সেইদিকে সে চলে গেল। না ভাই, বৃথা কথা ভেবে মনকে প্রবোধ দিও না। তা হতে পারে না, তা হয় নাই, সে কথা ভেব না। মন দৃঢ় কর, লক্ষ্মীর কথা ভুলে যাও ভাই। মনে কর আমার কেউ নেই। মা দুর্গতিনাশিনি, এ কি করলে মা?"

“আপনি যাই বলুন দাদা, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি নে। লক্ষ্মী কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না—কিছুতেই না। আজ সতরো বছর তাকে দেখে আসছি, একদিন আধ দিন নয়—সতরো বছর তাকে কোলে করে মানুষ করেছি। সে এমন হতেই পারে না। আপনি ও-কথা মনেও স্থান দেবেন না। না, না, সে কিছুতেই সম্ভব নয়—কিছুতেই না। আপনারা চুপ করে থাকুন। গোলমাল করে লোক জানাজানি করবেন না। আমি একবার ভাল করে খুঁজে দেখে আসি। সারারাত্রি খুঁজে দেখ্‌ব—বন-জঙ্গল খুঁজে দেখব। তারপর যা হয় হবে; যে বোঝা বইতে হয় বইব। বড় বৌ, লণ্ঠনটা জ্বেলে দাও ত? কেঁদ না বড় বৌ! লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু লক্ষ্মী কুলত্যাগিনী হতে পারে না,—তোমার মত সতীমায়ের মেয়ে কিছুতেই কুপথে যেতে পারে না বড় বৌ! এ আমার স্থির বিশ্বাস। তোমরা কিছু ভেব না। আমার মন বল্‌ছে, কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আমি যাই, আর বিলম্ব করব না। রাতও বোধ হয় আর বেশী নেই। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি, তোমরা কিছু কোরো না।”

ছোটবৌ ইতিমধ্যেই লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিয়াছিল। হরেকৃষ্ণ যখন বাহির হইবেন, তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন, “ভাই হরি, কেন আর কষ্ট করবে? যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন অনর্থক পথে-পথে ঘুরে কি হবে?”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "না দাদা, আমি একবার চারিদিকে সন্ধান না নিয়ে থাকতে পারছি নে।"

হরেকৃষ্ণ বাড়ীর বাহির হইলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার চিন্তা হইল, এখন কোন্ দিকে যাই। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, সব দিকই ত আছে। কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিব।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, পুকুরটা আর একবার ভাল করিয়া দেখা যাক্। তখন তিনি ভট্টাচার্য্যদিগের পুকুরের দিকে গেলেন। লণ্ঠন ধরিয়া অনেকক্ষণ পুকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জলে সামান্য একটু চাঞ্চল্যও তিনি দেখিতে পাইলেন না; পুকুরের চারিপাশ বিশেষ মনোযোগের সহিত ঘুরিয়া দেখিলেন; কোথাও পায়ের দাগ, ঘাসপাতার অপসারণের কোন চিহ্নই দেখিলেন না।

পুষ্করিণীর তীর ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় রাস্তায় উঠিলেন। একবার মনে হইল গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে বাগানগুলি আছে, সেই দিকেই যান; পরক্ষণেই ভাবিলেন, দক্ষিণ দিকের মাঠটাই একবার দেখিয়া আসি, তাহার পর বাগানের দিকে যাওয়া যাইবে।

রাস্তার পার্শ্বেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়ী। বাহিরের ঘরখানি একেবারে রাস্তার ধারে। হরেকৃষ্ণ যখন সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, তখন সেই ঘরের বারান্দা হইতে শব্দ হইল, "কে যায়?"

বৃদ্ধ মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বাহিরের ঘরেই থাকিতেন। এ স্বর তাঁহারই। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আজ্ঞা, আমি হরেকৃষ্ণ, কাকা মশাই।"

"হরেকৃষ্ণ, তা বাবা এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ? বাড়ীতে কি কারও অসুখ-বিসুখ হয়েছে।"

হরেকৃষ্ণ মহা বিপদে পড়িলেন; বৃদ্ধের প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, সহসা ভাবিয়া পাইলেন না। মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই বলিলেন, "এই রাঙ্গা গাইটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়া গিয়েছে, কাকা মশাই! গোয়ালে শব্দ শুনে উঠে দেখি, রাঙ্গা গাইটা নেই। কার ক্ষেতের ধান খাবে, কে হয় ত খোয়াড়ে দেবে, না হয় বেঁধে রাখবে; তাই সেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আপনি এখনও জেগে কাকা মশাই!"

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আরে বাবা, আমার কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার কি রাত্তিরে ঘুম আছে, উঠ-বস করেই রাত কাটে। এই একটু তন্দ্রার মত হয়েছিল, আর অমনি জেগে উঠেছি। তা যাও বাবা, দেখগে গরুটা কোথায় গেল। আজকালকার দিনে গরু পোষাও এক হাঙ্গামা হয়েছে।"

হরেকৃষ্ণ আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্রাম ছাড়িয়া একেবারে মাঠের রাস্তায় পড়িলেন। কোথাও জনমানবের সম্পর্ক নাই। এত রাত্রিতে মাঠে কে থাকিবে। হরেকৃষ্ণ একবার মনে করিলেন, এ দিকে আর অগ্রসর হইয়া কি

হইবে, গ্রামে ফিরিয়া বাগানের দিকেই যাই। আবার মনে করিলেন, এতদূরই যখন আসিয়াছি, আরও একটু আগাইয়া দেখি; এখনও ত রাত আছে। এই দিকেই আর একটু যাই।

একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু দূরে দুই তিনজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। হরেকৃষ্ণ হাঁকিলেন, "কে ওখানে?"

তাঁহার ডাক শুনিয়াই লোক কয়েকটা মাঠের মধ্য দিয়া অপর দিকে দৌড়িল। হরেকৃষ্ণের মনে সন্দেহ হইল। তিনি তখন, যেখানে লোক কয়েকটা দাঁড়াইয়াছিল, সেই অভিমুখে দৌড়িলেন। অধিকদূর যাইতে হইল না—একটু যাইয়াই দেখিলেন, কাহার দেহ মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছে। হরেকৃষ্ণ নিকটে যাইয়া দেখেন, লক্ষ্মী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তিনি তখন লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার নাকের নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিঃশ্বাস বহিতেছে; নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—নাড়ীর গতি আছে। ডাকিলেন, "লক্ষ্মী, মা আমার!"

উত্তর নাই,—বুঝিলেন, লক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা। আর বিলম্ব করা চলে না।

হরেকৃষ্ণ তখন লণ্ঠনটা নিবাইয়া সেখানে রাখিয়া দিলেন,—আলো দেখিয়া পাছে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়;—আলো লইয়া যাইবারও উপায় ছিল না। লক্ষ্মীর অচৈতন্য দেহ স্কন্ধের উপর ফেলিয়া হরেকৃষ্ণ গ্রামের দিকে দৌড়িলেন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ীতে পৌঁছিয়া লক্ষ্মীর অচেতন দেহ বারান্দায় শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এই নেও বড় বৌ, তোমার লক্ষ্মী। শিগ্‌গীর জল নিয়ে এস, বাতাস কর। লক্ষ্মী অচেতন হইয়াছে।"

সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টায় লক্ষ্মীর জ্ঞান সঞ্চার করিলেন। লক্ষ্মী চারিদিক চাহিয়া একবার অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "মা গো।" তাহার পরই পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী সংজ্ঞালাভ করিল; কিন্তু তখন তাহার ভয়ানক জ্বর। হরেকৃষ্ণ রাত্রিতেই সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাত্রির ঘটনা যেন ঘূণাক্ষরেও কাহারও কর্ণগোচর না হয়, তাহা হইলে লোক-নিন্দার ত সীমাই থাকিবে না—তাঁহাদিগকে একঘরে হইতে হইবে। লক্ষ্মীর জ্বর হইয়াছে, এই কথাই প্রকাশ থাকিবে। লক্ষ্মীকেও যেন এই ব্যাপার সম্বন্ধে কখন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা না হয়, এ বিষয়েও তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন।

এক দিন চলিয়া গেল, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হইল না। জ্বর যে ভয়ানক, এই জ্বরে যে লক্ষ্মীর জীবন শেষ হইতে পারে, দুই ভাই-ই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ডাক্তার ডাকিলেই রোগের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে বলিতে হইবে, নতুবা ঔষধে কোন ফলই হইবে না। কিন্তু প্রকৃত কথা ত প্রকাশ করা কিছুতেই হইতে পারে না; বড় কর্ত্তা বলিলেন, "মেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মারা যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু এ কলঙ্কের কাহিনী প্রকাশ করিয়া সমাজে হেয় ও পতিত হইতে আমি পারিব না।"

নিজেরাই যাহা ভাল মনে করিলেন, এবং যাহা জানিতেন, সেই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা পরদিন করাই স্থির হইল। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর জ্বরের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন, এবং ডাক্তার ডাকিবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

দুই দিন গেল জ্বর কমিল না। এ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মেয়েকে এমন ভাবে ফেলিয়া রাখা অকর্ত্তব্য বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর মা বলিলেন, "তিন দিন দেখা যাক্, যদি জ্বর না ছাড়ে, তা হলে কাজেই ডাক্তার দেখাতে হবে।"

ভগবানের কৃপায় তৃতীয় দিনে লক্ষ্মীর জ্বর অনেকটা কম হইল, কিন্তু পেটে অসহ্য বেদনা। টোট্‌কা ঔষধে বিশেষ কোন ফল হইল না; প্রতিবেশিনী একজন জলপড়া জানিতেন, তাহা আনা হইল বটে, কিন্তু লক্ষ্মীকে খাওয়ান হইল না; কারণ যে কারণে পেটে এমন অসহ্য বেদনা হইয়াছে, এ জলপড়ায় তাহার কি হইবে? এ দিকে প্রকৃত চিকিৎসার পথও একেবারে বন্ধ। লক্ষ্মী ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিল। বাড়ীর সকলে অনন্যোপায় হইয়া তাহার এই কষ্ট এই যাতনা দেখিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মনে যাহা আসিল, সেই প্রকার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর অদৃষ্টে গুরুতর কষ্ট, গভীর বেদনা লেখা আছে; সে এ যন্ত্রণায় মরিবে কেন? দুই-তিনদিন কষ্ট পাইবার পর তাহার যন্ত্রণার লাঘব হইল; জ্বরও ছাড়িয়া গেল। কিন্তু শরীর এমন দুর্ব্বল ও অবসন্ন যে,

সে উঠিয়া বসিতে পারে না। পাঁচ দিনের অসুখ তাহাকে একেবারে মৃতকল্প করিয়া ফেলিয়াছিল।

লক্ষ্মীর শরীরের জ্বর ছাড়িলে কি হয়, মনের জ্বর যে ছাড়ে না; সুধু ছাড়ে না নহে—সে জ্বর যে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যে কয়দিন সে অজ্ঞান হইয়া ছিল, সে কয়দিন তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছিল; তাহার হৃদয়ের জ্বালা ত সে বুঝিতে পারে নাই। এখন জ্ঞান-সঞ্চারের পর হইতে তাহার হৃদয়ে যে তুষানল জ্বলিয়া উঠিল, কিছুতেই ত তাহা নির্ব্বাপিত হয় না; পৃথিবীতে এমন চিকিৎসক নাই—এমন কোন ঔষধ নাই, যাহাতে তাহার জ্বালা দূর করিতে পারে। এক চিকিৎসক যম; কিন্তু সে ত আসিয়াও ফিরিয়া গেল, তাহাকে লইয়া গেল না; আরও কষ্ট ভোগের জন্য তাহাকে রাখিয়া গেল। সে বিছানায় পড়িয়া সুধুই ভাবে, কি অপরাধে আমার এমন কঠোর শাস্তি হইল? এ জীবনে এমন কি পাপ করিয়াছি, তাহার ফলে এই নরকভোগ আমার অদৃষ্টে লিখিত হইয়াছিল? যাহারা আমাকে লইয়া গেল, তাহারা মারিয়া ফেলিল না কেন? তাহা হইলে ত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।”

এক একবার ভাবে, কে তাহারা, যাহারা তাহার এ সর্ব্বনাশ করিল? সে ত কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। অন্ধকার রাত্রিতে চোরের মত আসিয়া তাহার জীবনের যাহা সার রত্ন, তাহাই চুরী করিল। কে তাহারা? ওগো দয়াময়, একবার বলিয়া দেও, কে তাহারা? বিধাতা, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ে

করিয়া জন্ম দিলে যদি প্রভু, তবে কুৎসিত করিলে না কেন? রূপ দিলে কেন দয়াময়? এই রূপই যে আমার কাল হইল। আমার যদি রূপ না থাকিত, আমি যদি কুৎসিত হইতাম, তাহা হইলে ত কেহ আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, আমার সর্ব্বনাশের জন্য এমন ষড়যন্ত্র করিত না, আমার নারীজন্ম এমন [illegible] করিয়া দিত না। আমি ত কিছুই চাহি নাই! আমি ত বিবাহের জন্য কাতর হই নাই। তোমরা বিশ্বাস কর—ওগো তোমরা বিশ্বাস কর—আমি দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—আমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা-পিতার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যৌবনের চাঞ্চল্য ত একটুও অনুভব করি নাই;—আমি কোন দিন স্বপ্নেও সে কথা ভাবি নাই;—আমার হৃদয়ে ত কোন বাসনা জাগে নাই;—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, আমি কখন কোন দিন কাহারও দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহি নাই। গ্রামের কত যুবক—কাহার নাম করিব—কত পাষণ্ড আমার দিকে লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু এক দিনের জন্য,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ত কাহারও দিকে আকৃষ্ট হই নাই। আমি বেশ ছিলাম—আমি ঘর-সংসার লইয়া নীরবে জীবন-পাত করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি ত কোন দিন যৌবনকে আমল দিই নাই;—সংসারের কাজকর্ম্ম করিতাম, অবসর সময় রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া, বাবার সঙ্গে নানা কথার আলোচনা করিয়া, নানা উপদেশ গ্রহণ করিয়া বেশ সচ্ছন্দে সময় কাটাইতেছিলাম। আমার বিবাহ দিতে না পারিয়া বাবা কাকা মনে কত

কষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সে কথা একদিনের জন্যও আমার মনে হয় নাই ;—একদিনের জন্যও আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করি নাই। তবে আমার উপর এ গুরু দণ্ড, এ কঠিন বজ্রাঘাত কেন হইল? কে বলিয়া দিবে, কোন্ পাপের এ শাস্তি? আমি কুমারী নহি—এখন আমি কুমারী বলিয়া ত মনে করিতে পারিতেছি না। আমি সধবাও নহি—আমি হয় ত বিধবাও নহি। তবে আমি কি? আমি কিছুই নহি; আমি মানুষের বাহিরে গেলাম যে! বাবা কাকা আমার জন্য কি কষ্টই না নীরবে সহ্য করিতেছেন; মা আমার সর্ব্বদা বিষণ্ণ, আমার মুখের দিকে চাহিতে পারেন না; আমার স্নেহময়ী কাকীমা আমার কাছে বসিয়া কাঁদেন; পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, ভয়ে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলেন। কেহ একটা সান্ত্বনার কথাও আমাকে বলেন না,—সবাই চুপ করিয়া গিয়াছেন। এমন করিয়া জীবন যাপন করা যে বড়ই কষ্টকর! কিন্তু কি করিব? এক পথ,—আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করা। আত্মহত্যা? না, না—তাহা আমি পারিব না। সে যে মহাপাপ—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি পাপে এই ফল ভোগ করিতেছি; তাহার উপর আবার আত্মহত্যা করিয়া আরও মহাপাপ সঞ্চয় করিব। না, তাহা পারিব না। এই যন্ত্রণা, এই অন্তর্দ্দাহ নীরবে ভোগ করাই আমার অদৃষ্টলিপি। বাবা বলেন, 'মা লক্ষ্মী, একটু একটু শাস্ত্রালোচনা কর, শরীর মন ভাল হইবে।' তা পারি কৈ? কিছুই যে ভাল লাগে না—কিছুতেই যে মন যায় না। আমার শরীর যে কলুষিত হইয়াছে—আমি যে এখন

কিছুরই অধিকারী নহি। মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, ইহার অধিক আমার আর কি দুর্গতি হইতে পারে মা! এইবার দুর্গতি নাশ কর—আমাকে কোলে টানিয়া লও। আমার শরীর অপবিত্র হইয়াছে; কিন্তু তুমি ত জান মা! আমার হৃদয় ত কলুষিত হয় নাই। এক একবার ঐ কথাই ত ভাবি—ঐ কথা ভাবিয়াই ত মনকে প্রবোধ দিতে চাই। ভাবি, দেহ কলুষিত হইয়াছে, তাতে কি? আমার হৃদয়ে ত কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আমি ত কুমারী-ধর্ম্ম স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিই নাই—সজ্ঞানে ত আমি কিছু করি নাই। তবে ভাবি কেন? আমি যেমন ছিলাম, তাই আছি। স্বপ্নের মত সে রাত্রির ঘটনা মনে করি না কেন? কিন্তু, তা যে পারি না,—কিছুতেই পারি না—মন যে প্রবোধ মানে না। থাকিয়া থাকিয়াই মনে হয়—আমি ত সে আমি নই। কিছুতেই যে সে কথা ভাবিতে পারি না—স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। এমন কি কোন ঔষধ নাই, যাহাতে আমার জীবনের ঐ কাল রাত্রির সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া দিতে পারে। না, না, এ স্মৃতি মুছিবার নহে—ইহা আমার আমরণ সঙ্গী থাকিবে। কি যে কষ্ট পাইতেছি—কি নরক-যন্ত্রণা যে ভোগ করিতেছি, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব। কাহাকেও যে বলিব, সেপথও আমার বন্ধ। সে দিনের ঘটনা যে সকলে গোপন করিয়াছে; নতুবা কলঙ্কে যে দেশ ভরিয়া যাইবে। কেহ সে কথার উল্লেখ মাত্রও করে না, তাহার কারণ কি আর আমি বুঝিতে পারি না। বাবা যখন আমার বিছানার

পার্শ্বে বসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা লক্ষ্মী, কেমন আছ মা ?' তখন যে সেই স্নেহের স্পর্শে, সেই আদরের সম্বোধনে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, ইচ্ছা করে চীৎকার করিয়া বলি, 'বাবা, আমি তোমার লক্ষ্মী নই—আমি অলক্ষ্মী। কেন এমন পবিত্র নাম আমাকে দিয়াছিলে বাবা !' কিন্তু কিছুই বলিতে পারি না—আমার শোকসিন্ধু তখন উথলিয়া উঠে, আমি বালিসে মুখ চাপিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণা লুকাইতে চেষ্টা করি ; বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া যান। মা, কাকী, কাকা, সকলেরই ঐ দশা। হায় ভগবান ! এ কি করিলে ? আমার মা যে একটি কথাও বলিতে পারেন না ; আমার কাছে আসিলেই যে তাঁহার চোখ দুটী জলে ভরিয়া যায়। এ দৃশ্য যে আর দেখিতে পারি না !”

৫

লক্ষ্মী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, দেখিয়া তাহার পিতা-মাতা, কাকা কাকী সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন ভাবে বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিলে লক্ষ্মী যে আর বাঁচিবে না—এ কথা বাড়ীর সকলে কেন, প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের কারণ যে মনে, তাহা বুঝিতে ঘরের কাহারও বাকী ছিল না। সে রোগের ঔষধ এক মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া আর কে দিতে পারেন? অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, ডাক্তার ডাকিয়া কাজ নাই, কবিরাজ দ্বারাই একবার লক্ষ্মীকে দেখান যাউক। কবিরাজ মহাশয়কে মোটামুটি শরীরের দুর্ব্বলতার কথাই বলা হইবে, অন্য কোন তথ্যই দেওয়া হইবে না; তাহাতে চিকিৎসা যতদূর হয় হউক।

গ্রামেই একজন কবিরাজ ছিলেন; তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ততটা ছিল না, কিন্তু বহুদিন চিকিৎসা করিয়া, অনেক রোগী দেখিয়া তাঁহার বহুদর্শিতা জন্মিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় বয়সে প্রাচীন, নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবি-চিন্তামণি। কাঞ্চনপুর ও নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে মণি কবিরাজ মশাই বলিত। হরেকৃষ্ণ এক দিন প্রাতঃকালে কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে

যাইয়া লক্ষ্মীর অসুখের কথা বলিলেন। মণি কবিরাজ মশাই রোগের বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "পুরাতন জ্বর, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। আমি এখন আর যাইতে পারিব না, অপরাহ্নে যাইয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিব।"

অপরাহ্ন চারিটার সময় মণি কবিরাজ মশাই বন্দ্যোপাধ্যায়-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; দুই তিনবার দেখিলেন; দুই চারিটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বড় কর্ত্তা ও হরেকৃষ্ণ বেশ বুঝিতে পারিলেন, বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয় রোগ-নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "রামকৃষ্ণ দাদা, লক্ষ্মীর রোগ ত নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমাদের শাস্ত্রের কোন লক্ষণের সঙ্গেই ত রোগ মিলিতেছে না। নাড়ীতে জ্বরের কোন নিদর্শনই নাই: তবে নাড়ী একটু দুর্ব্বল, আর ত কিছুই দেখি না। মা লক্ষ্মী যা যা বলিল, তাহাতেও কোন কিনারা পাইলাম না। এখন কি ব্যবস্থা করি, তাহাই ত বিষম সমস্যার কথা। কি করিতে কি করিয়া না বসি। আমি বলি কি রামকৃষ্ণ দাদা, ঔষধপত্র কিছু দিয়া কাজ নাই। পথ্যের একটু ব্যবস্থা কর; পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে দেও; চলিতে-ফিরিতে বা কোন শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে দিও না। তাতেই হয় ত উপকার হইতে পারে। পাঁচ সাত দিন এই ভাবে চালাইয়া দেখা যাক্। তাতে যদি কোন উপকার বোধ না হয়, তখন আবার দেখিয়া যাহা হয় করা যাইবে। তবে

একেবারে কিছু ঔষধ না দেওয়াও—তাই ত কি করা যায়।—যাক্, এক কাজ কর। আমি সাত দিনের মত মকরধ্বজ দিয়া যাইতেছি; সুধু মধু অনুপান দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটু করিয়া দিও; তাতে শরীরে রক্তসঞ্চার হইবে, দুর্ব্বলতাও হয় ত দূর হইতে পারে। আপাততঃ এই রকমই চলুক। কি বল?"

সাত দিন গেল; মকরধ্বজ ব্যবহারে কোন উপকারই দেখা গেল না, লক্ষ্মীর দুর্ব্বলতা কমিল না। হরেকৃষ্ণ পুনরায় মণি কবিরাজ মশাইয়ের নিকট গেলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ, রোগই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, ঔষধ কি দেব। বৃথা ঔষধ দেওয়া আমাদের শাস্ত্রের নিষেধ। রোগ বুঝিতে না পারিয়া আন্দাজী ঔষধ দিলে যদি বিপরীত ফল হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর জন্য চিকিৎসক পাপগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আমি জানিয়া শুনিয়া এমন পাপের কার্য্য আর এ বয়সে করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, লক্ষ্মীর যে রোগই হইয়া থাকুক, তাহা সাংঘাতিক নহে; সুতরাং তোমরা চিন্তিত হইও না। কিছুদিন দেখাই যাক্ না, অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না। তখন হয় ত রোগ স্থির করিলেও করা যাইতে পারে। আপাততঃ কিছুদিন কোন ঔষধই দিয়া কাজ নাই।"

তাহাই হইল। লক্ষ্মীর অবস্থা একই ভাবে রহিল, কোন উন্নতিও হইল না, বিশেষ অবনতিও তেমন দেখা গেল না।

এই ভাবে চারি মাস অতীত হইল। লক্ষ্মীর মা এই চারি মাস পরে কিন্তু রোগ ধরিতে পারিলেন। তিনি মাথায় হাত দিয়া

বসিলেন। সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এ রোগের কথা তিনি কেমন করিয়া তাঁহার স্বামী বা দেবরকে বলিবেন। কবিরাজ কি বুঝিয়াছেন, তিনিই জানেন; অথবা তিনি সত্যসত্যই রোগ ধরিতে পারেন নাই; কিন্তু লক্ষ্মীর মা ঠিক রোগ ধরিয়াছেন;—লক্ষ্মী গর্ভবতী হইয়াছে; পুরুষে এ রোগের লক্ষণ সহজে ধরিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীলোক ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন।

বড় গিন্নীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও তিনি এত বিচলিত হইতেন না। এখন উপায়? জাতি গেল, মানসম্ভ্রম গেল, লোকের কাছে যে মুখ দেখান যাইবে না। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মুখে যে চূণ-কালী পড়িল। দুই তিন দিন বড় গিন্নী অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন উপায়ই দেখিলেন না। অবশেষে তিনি আর চুপ থাকিতে পারিলেন না;—সকল দিক কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একদিন হরেকৃষ্ণকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুরপো, জাত মান সব যে যায়।"

হরেকৃষ্ণ বড় গিন্নীর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় বৌ, তুমি কাঁদ কেন? কি হয়েছে তাই বল? জাত মান যায়—এ কথার ত কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব ঠাকুরপো। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সব গেল। তোমরা ত মেয়ের অসুখ কি, তা ঠিক করতে পার নাই; আমি বুঝেছি। লক্ষ্মী

"অ্যাঁ, কি বল্‌ছ তুমি বড় বৌ! তুমি পাগল হ'লে না কি। তাও কি কখন হয়—এও কি সম্ভব।"

"ঠাকুর পো, আমার ভুল হয় নাই। আজ এই চার মাস আমি দিনরাত দেখে আসছি। আমি যা বল্‌ছি তাই ঠিক। লক্ষ্মী সুধুই বলে আমার পেটের মধ্যে যেন কেমন করে। হতভাগী কিছুই ত বুঝতে পারে নাই। তুমি তার মুখের দিকে, তার চেহারার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তা হলেই জানতে পারবে।"

হরেকৃষ্ণ যেন আকাশ হইতে ভূতলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "বড় বৌ, এখন উপায়! সত্যই ত জাত মান সম্ভ্রম সব যায়, সমাজে যে মুখ দেখান যাইবে না। দাদাকে এ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব। প্রাণ থাকতে ত এমন ভয়ানক কথা আমি দাদাকে বলতে পারব না বড় বৌ! লক্ষ্মী বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারে নাই।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "না, সে কি করে বুঝবে!"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার যে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছে। হায় মা দুর্গা, এ কি বিপদে ফেলিলে? উদ্ধারের যে কোন উপায়ই দেখি না। এরূপ কথা শোনার চাইতে লক্ষ্মী সেই কাল রাত্রিতে মাঠের মধ্যে মরল না কেন? তাকে খুঁজে আনতে গেলাম কেন? তাকে ঘরে এনে বাঁচালাম কেন? এখন যে সব যায় বড় বৌ, সব যায়।" এই বলিয়া হরেকৃষ্ণ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বড় গিন্নী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “কাঁদলে কি হবে, ঠাকুর পো। আমি সারা দিনই কাঁদছি। এখন কি করা যায়, তাই ঠিক কর। কাঁদবার সময় অনেক পাবে—জীবনকালই কাঁদতে হবে।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তা আমরা কি করে বলব। তুমি দাদার কাছে সব কথা বল। তিনি যা বলবেন, তাই করা যাবে। আমি তাঁকে এ কথা কিছুতেই বলতে পারব না।”

বড় গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কি আর করব, যখন গর্ভে মেয়ে ধরেছি তখন আমাকেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—আমিই বড় কর্ত্তাকে বলব।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “কিন্তু বড়বৌ এ কথা ঠিক, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ নেই। তার অদৃষ্টের দোষ!”

বড়গিন্নী বলিলেন, “সে কথা কি আর আমি বুঝতে পারছিনে। মেয়ে যদি ইচ্ছে করে কুপথে যেত, তা হ’লে তাকে কি ক্ষমা করবার কথা তোমাকে আমি বলতাম। কিছুতেই না; কিন্তু লক্ষ্মী ত কোন অপরাধই করে নাই; সেই জন্যই ত আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুর-পো! হায় মা দুর্গা, এ কি করিলে মা! আমার যে ঐ একমাত্র সন্তান। লক্ষ্মী যে আমার বড় আদরের মেয়ে ঠাকুর-পো। তার অদৃষ্টে এ কি হইল।” বড় গিন্নী আর কথা বলিতে পারিলেন না।

৬

পরদিন প্রাতঃকালে হরেকৃষ্ণ যখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন বড় কর্ত্তা বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন; বলিলেন, "হরি, ব্যাপার শুনেছ ত ?"

হরেকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্ব রাত্রিতে বড় গিন্নী লক্ষ্মীর কথা দাদাকে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "শুনেছি।"

"কি করা স্থির কর্‌লে ?"

"আমি আর কি বলব; আপনি যে পরামর্শ দিবেন, তাই করা যাবে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "শুনলাম, এই ঘটনায় তুমি বড়ই কাতর হয়েছ।"

বড় কর্ত্তা যে ভাবে কথা কয়টী বলিলেন, তাহাতে হরেকৃষ্ণ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। এমন গুরুতর ঘটনা—জাত মান সম্ভ্রম নিয়ে কথা, অথচ তাঁহার দাদা এ সংবাদে যে একটুও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার কথার ভাবে এবং তাঁহার আকার প্রকারে তিনি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এ দিকে তিনি কিন্তু এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই।

হরেকৃষ্ণ দাদার কথার কোন উত্তরই দিলেন না—তিনি আর কি বলিবেন—চুপ করিয়া থাকিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বড় কর্ত্তা বলিলেন, "হরি, তুমি ছেলেমানুষ; তাই এত কাতর হয়েছ। এতে কাতর হবার বা চিন্তা করবার বিশেষ কিছু নাই। তুমি আমাদের সমাজের অবস্থা জান না, তোমাকে সে সব কখন জান্‌তেও দিই নাই। এই বয়সে আমি ও-রকম ব্যাপার অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। তুমি ত শোন নাই, দেখ নাই, তোমার ভ্রাতৃবধূও অত-শত জানেন না; তাই তোমরা ভেবে আকুল হয়েছ। ভাই, আমাদের কুলীনের ঘরে এমন হয়ে থাকে; আর তার সহজ ব্যবস্থাও আছে। তুমি এক কাজ কর; ও-পাড়ার বিদ্যা-মুচীকে ত জান; তার মাকে একবার ব'লে এস, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। তার পর যা হয়, সে আমি করব; তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।"

হরেকৃষ্ণের বয়স ৩২ বৎসর। দশবৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়; দাদা ও পিসিমা তাঁহাকে মানুষ করেন। রামকৃষ্ণ ছোট ভাইকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন; নিজেই ব্যাকরণ কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান। ভাই যাহাতে কোন প্রকার কু-সংসর্গে মিশিতে না পারে, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া হরেকৃষ্ণ অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াছিলেন; সুতরাং দাদার কথার কোন মর্ম্মই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

বড় কর্ত্তা রামকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াই কথাটা বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন, "হরি, তুমি আমার কথা মোটেই বুঝতে পার নাই, তোমার মুখ দেখেই তা জানতে পারা যাচ্ছে। তুমি এতবড় হয়েছ, কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যে গোপনে কত কি হয়ে থাকে, তার খবরও তুমি রাখ না। আমিই তোমাকে সাবধানে রেখে সে সব জানতে দিই নাই। তাই তুমি আমার কথা শুনে অবাক্ হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে একটা কথা বলি; এই যে আমাদের কুলীনের ঘরের মেয়েরা কেহ বা চিরজীবন কুমারী থাকিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়; কাহারও বা নামমাত্র বিবাহ হয়; স্বামীর সহিত জীবনে হয় ত কাহারও দ্বিতীয়বার দেখাও হয় না; কাহারও বা সৌভাগ্যক্রমে জীবনের মধ্যে দুই চারিদিন দেখা হয়। এখন বল ত, এই সব মেয়েরা সকলেই কি পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে থাকে?। হাঁ, এমন দুদশজন আছে, তারা দেবী, তারা প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী ভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে জীবন কাটাইয়া যায়, কিন্তু অপরের কি অবস্থা হয়, তা কি কখনও ভেবে দেখেছ? কোন দিন কি সে-দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ে নাই?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি ত কাহাকেও কোন অন্যায় ব্যবহার করিতে দেখি নাই, বা শুনি নাই। আমার বিশ্বাস, পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার ঔরসে জন্মলাভ করিয়া, কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাই কুপথে যেতে পারে না। অন্ততঃ আমাদেব গ্রামে ত এমন দেখি নাই, বা শুনি নাই।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ নাই, সে তোমার সৌভাগ্য ; আর শোন নাই, ভাল কথা ; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, যা দেখ নাই, বা শোন নাই, আজ তা দেখ্‌তে পেলে, আর আমি, তোমার দাদা হয়ে সেই কথা তোমাকে শোনাতে বাধ্য হলাম।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার একটু ভ্রম হয়েছে দাদা। আমাদের লক্ষ্মী ত কুপথগামিনী হয় নাই ; কি হয়েছে, তা ত আপনি জানেন।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমি লক্ষ্মীর কথা বলছি না। বাড়ীতে যা দেখতে পেলে, তাতে লক্ষ্মীর কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাকে যদি দৃষ্টান্ত দেখাই, তা হলে তুমি ঘৃণায় অধোবদন হবে ভাই! তা কাজ নেই ; পরনিন্দা, পর-কুৎসা তোমার কাণে ঢেলে দিতে চাই না। তবে এই কথা জেনে রেখ যে, এই কৌলীন্যপ্রথা যে কি বিষময় ফল দিচ্ছে, তা তুমি বেশ বুঝতে পারছ। যারা আজীবন কুমারী থাকে, বা যারা বিবাহিতা হয়েও কোন দিন স্বামী-সংসর্গ লাভ করতে পারে না, তাদের মধ্যে সকলেই যে, নারীধর্ম্ম,—সতীত্ব—রক্ষা করে চলতে পারে, এ কথা মনেও কোরো না ; রক্তমাংসের অত্যাচার থেকে যে সব মেয়ে এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছে, বা করতে পারে, তারা দেবী ; তাদের সতীধর্ম্মের কল্যাণেই আমরা এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু সকলেই কি তা পারে। পারে না, সুতরাং সমাজের মধ্যে থেকেই, ঘর-গৃহস্থালীর মধ্যে থেকেই কত কু-কার্য্যের অনুষ্ঠান

করে ; আর আমরা আমাদের জাতি-মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য সে সকল অম্লানবদনে সহ্য করি, গোপন করি। তার ফলে কত ভ্রূণহত্যা হয়ে যায়। কলঙ্ক গোপন করবার জন্য আর ত পথ নাই। এমনই ভাবেই আমাদের সমাজ চলে আস্‌ছে। তুমি ত এ সকলের সংবাদ রাখ না—এতকাল রাখতেও দিই নাই ; কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তোমাকে আজ এ সব কথা বল্‌তে হোলো। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি কাতর হয়েছ, আমি হই নাই। তুমি পথ জান না, আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। এখন বুঝেছ, কেন বিন্ধ্যার মাকে ডাকৃতে বল্‌লাম। এ সব কাজ সে-ই করে থাকে। তাকে ডেকে আন্‌লেই সে সব ঠিক করে নেবে ;—গোপনেই এ সব কাজ হয়ে থাকে। তোমার ভ্রাতৃজায়াও তোমারই মত কি না, তাই তিনিও তোমারই মত আকুল হয়ে পড়লেন।”

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “এ ছাড়া কি আর পথ নেই ? এমনই করেই কি, এমন পাপের কাজ করেই কি এত কাল আমাদের সমাজ টিকে আছে ?”

“হ্যাঁ, তাই আছে ভাই—, কিন্তু আর অধিক দিন টিক্‌বে না ; এ কঠোর কৌলিন্যপ্রথার আয়ূ ফুরিয়ে এসেছে ; তুমি ঠিক বলেছ, এত পাপ ধর্ম্মে সয় না। কিন্তু তা বলে উপায় নেই। সমাজের এ দাসত্ব আমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পার[illegible] শুনেছি, তখনহ[illegible] হোক, অধর্ম্মাচরণ কোরে হোক বংশ-ফেল্‌তে যদি চাও, তাতে তার জন্য আমরা দয়া মায়া স্নেহ . ভাল। বল, তুমি আমাকে

মেরে ফেলবার জন্য বিষ এনেছ, আমি এখনই তা খাবো ; কিন্তু অমন কাজ কোরো না মা। তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তোমরা এমন পাপের কাজে হাত দিও না। আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। তোমরা সমাজের ভয়ে আমাকে এ পাপ কাজ করতে বল্‌ছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু, আমি সমাজের ভয় করিনে। তোমরা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেও, আমাকে কোথাও ফেলে এস, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাব, সেও স্বীকার ; কিন্তু এমন পাপের কাজ করতে পারব না, তোমাকেও করতে দেব না।”

মা বলিলেন, “লক্ষ্মী, ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে মা! তোমাকে কি আমি ছাড়তে পারি। আমার দিকে চেয়ে, তোমার বাপ-কাকার কথা মনে করে, আমার কথা শোন।”

লক্ষ্মী বলিল, “মা, আমি কা’ল সারা রাত ভেবেছি। আমার প্রতিজ্ঞা, এমন কাজ কিছুতেই করতে দেব না—কিছুতেই না। তুমি বাবাকে বল, কাকাকে বল ; তাঁরা আমাকে ত্যাগ করুন, আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।”

মা বলিলেন, “তাতে কি ফল হবে, দেশে বিদেশে আত্মীয়বন্ধু সকলের কাছে যে ওঁদের মাথা হেট হবে ; জাত মান সব যাবে, লজ্জায় যে কেউ মুখ দেখাতে পারবে না ; একঘরে হয়ে থাক্‌তে হবে। তার ফল কি হবে জান, কর্ত্তা তা হলে একদিনও বাঁচবেন না ; আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে ; তারপর তোমার কাকা

কাকী চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাবেন, পথে পথে ভিক্ষা করে খাবেন। এই কি তার ফল হবে না?"

লক্ষ্মী বলিল, "ফল যাই হোক মা, তোমরা এমন কাজ কোরো না। তোমাদের মান বাঁচাবার জন্য আমি যে আত্মহত্যা করবার জন্য একদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু আর পাপ করব না; তাই আত্মহত্যা করতে পারি নাই। আর এখন—এখন ত কিছুতেই মরতে পারিনে মা!"

"তা হ'লে তুমি কি করতে চাও?"

"তোমরা আর যা বল্‌বে, তাই আমি করব; যত কষ্ট স্বীকার করতে বল্‌বে, তাতেই আমি সম্মত; কিন্তু তোমরা এ পাপের কাজ করতে কিছুতেই পারবে না। যদি জোর করে আমাকে ওষুধ খাওয়াতে চাও, তা হোলে তোমাদের মান সম্ভ্রম কিছুর দিকেই আমি চাইব না। আমি প্রকৃত কথা দশজনের কাছে বলে, তাদের আশ্রয় ভিক্ষা করব। তাতে তোমাদের যা হয় তাই হবে।"

মা বলিলেন, "তা হ'লে এই কথাই ওঁদের বলি গে।"

"হাঁ, এই কথাই বল গে; বল গে যে তাঁদের অভাগী মেয়ে তাঁদের মান সম্ভ্রম নষ্ট করতে চায় না; তাঁরা কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা করুন।"

"আর যে উপায় নাই মা! তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

"কেন উপায় থাকবে না। আমাকে বাড়ী থেকে কোন রকমে স্থানান্তরিত করে দেও, এত বড় পৃথিবীতে আমার স্থান

হবে, আমি ভিক্ষা করে খাব। তোমাদের কলঙ্কের কারণ হব না। হতভাগীর এ প্রার্থনা শোন মা! আমার মনে যে কি হচ্ছে, আমার বুকের মধ্যে যে কেমন করছে, তা আমি প্রকাশ করতে পারছি নে মা! মা গো! তুমি আমাকে রক্ষা কর—আমাকে আর ভয়ানক পাপে ডুবিও না।”

বড় গিন্নী যখন দেখিলেন যে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিলেন না, তখন বলিলেন, “তা হলে কর্ত্তাদের কাছে বলি গে, তাঁরা যা ভাল মনে করবেন, তাই হবে।”

বড় গিন্নী তখন লক্ষ্মীর অসাক্ষাতে হরেকৃষ্ণকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। হরেকৃষ্ণ আর এ কথার কি উত্তর দিবেন; তিনি দাদার নিকট যাইয়া বলিলেন, “দাদা, লক্ষ্মী সব কথা জান্‌তে পেরেছে। সে কিছুতেই ঔষধ খেতে চায় না। সে বলে, তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ করি।”

বড় কর্ত্তা বলিলেন, “লক্ষ্মীকে এ কথা জানানো ভাল হয় নাই। সে যখন জান্‌তে পেরেছে, তখন এমন পাপ কার্য্যে সে কিছুতেই সম্মতি দেবে না। সে শিক্ষা ত সে আমার কাছে কোন দিন পায় নাই। সমাজের ভয়ে সে পাপকার্য্য করবে না—এমন ঔরসে তার ত জন্ম হয় নাই ভাই হরি! লক্ষ্মী আমার যে সত্যসত্যই লক্ষ্মী!” বড় কর্ত্তা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না;—এতদিন যে বেদনা তিনি গোপনে হৃদয়ে পোষণ করছিলেন, আজ সে আত্মপ্রকাশ করিল;—তাঁহার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

হরেকৃষ্ণ নীরব। তাঁহারও নয়ন অশ্রুপূর্ণ; তিনি কি বলিবেন—বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

বড় কর্ত্তা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "শোন ভাই হরেকৃষ্ণ, একদিকে লক্ষ্মী, আর একদিকে সমাজ;—এক দিকে অপত্য-স্নেহ, আর একদিকে সমাজের ভয়;—একদিকে আমার মা লক্ষ্মী, আর একদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের যুগযুগান্তরের মান-সম্ভ্রম, সামাজিক মর্য্যাদা। ইহার কোন্‌টী রক্ষা করিবে ভাবিয়া দেখ। তোমার উপরই ভার দিলাম;—বল, তুমিই বল। আমার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া মান-সম্ভ্রম, বংশগৌরব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃপুরুষের এই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে চাও—ভিক্ষার অন্নে পরিবার প্রতিপালন করিতে চাও, বল,—তাহাই করি। আর যদি পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে দয়া মায়া, অপত্য-স্নেহ—সব বিসর্জ্জন দিয়া, লক্ষ্মীকে পথের ভিখারিণী করিয়া দাও—তাহাকে দূরদেশে ফেলিয়া এস—বাড়ীতে আসিয়া তাহার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা কর;—তোমার সব বজায় থাকিবে। বল, কোনটী শ্রেয়ঃ। কি তুমি করিতে চাও;—তোমার উপরই কর্ত্তব্যের ভার দিলাম। হরেকৃষ্ণ, লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী, একমাত্র সন্তান! মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায় ভাই!" তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না—বালকের মত অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হরেকৃষ্ণ নীরব—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। দুই ভাই-ই কিছুক্ষণ

নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট অতীত হইয়া গেল।

অবশেষে হৃদয়ে অমানুষী বল সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়স্বরে বড় কর্ত্তা বলিলেন, "হরি, তোমাকে কিছু স্থির করিতে হইবে না। আমিই মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। কি কর্ত্তব্য, আমিই বলিয়া দিতেছি। সন্তান-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া আমি পিতৃপুরুষের গৌরব নষ্ট করিতে পারিব না;—সে অধিকার তোমার আমার নাই। সমাজের কাছে আত্মবলি দিতেই হইবে—কাঞ্চনপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না ভাই! সমাজের চরণে কন্যাবলিই দিতে হইবে। ভগবান রামচন্দ্র লোকাপবাদ-ভয়ে প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নির্ম্মলচরিত্রা জানিয়াও বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহা ত জান। সেই হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই রামচন্দ্রের কথা মনে করিয়া আমরাও আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় একমাত্র কন্যাকে বনবাসে দিব—সমাজের ভয়ে—সমাজের মুখ চাহিয়াই এ কাজ করিতে হইবে। দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, পিতৃপিতামহের দেশপূজ্য বংশে কলঙ্কারোপ করিতে পারি না। লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সে যখন সমাজের দিকে চাহিবে না, আমাদের মান-সম্ভ্রমের দিকে চাহিবে না, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মনে করিও না ভাই, লক্ষ্মীকে আমি দোষ দিতেছি। সে যাহা বুঝিয়াছে, তাহা ঠিকই বুঝিয়াছে; পাপে লিপ্ত সে হইতে চাহে না। কিন্তু আমরা ত তাহা পারি

না ;—কিছুতেই পারি না। সমাজের ভয়ে লক্ষ্মী পাপের প্রশ্রয় দিতে চাহিতেছে না, এজন্য তাহার উপর রাগ করিতে পারি না —বরং তাহার প্রশংসাই করিতেছি ; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ত সে দৃঢ়তা নাই—আমরা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারি না।"

এতক্ষণ পরে হরেকৃষ্ণ কথা বলিলেন, "তা হোলে আপনি এখন কি করতে বলেন ?"

"কি করতে বলি শুন্‌বে ? আমি বলি ভ্রূণহত্যা করতে ; কিন্তু সে যখন তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত, তখন কলিকাতায় লইয়া চিকিৎসা করাইবার কথা প্রকাশ করিয়া, তুমি ও ছোটবৌমা তাকে নিয়ে কোথাও চলে যাও—আমাদের আর নিয়ে যেতে চেয়ো না—সে আমরা দুইজন পারব না ;—তোমাদেরই এ নৃশংস কাজ করতে হবে। তারপর—তারপর ভাই হরেকৃষ্ণ, আমার মা লক্ষ্মীকে যেখানে হয়, পথে বসিয়ে রেখে, তোমরা বাড়ীতে চলে এস,—প্রকাশ করে দিও লক্ষ্মী আমার মারা গিয়েছে। ইহা ছাড়া আর পথ নেই—ভাই পথ নেই। এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। ত্রেতাযুগে মহাপুরুষ লক্ষ্মণ ভাইয়ের আদেশে সীতাকে বনবাসে দিয়ে এসেছিলেন ; আর কলিযুগে তুমিও আমার লক্ষ্মণ ভাই, তুমিও তারই পুনরাভিনয় কর। আমার এ আদেশ অমান্য কোরো না। তা যদি না পার, বল, আমরা স্ত্রীপুরুষে বিষপানে আত্মহত্যা করি, তারপর যা তোমাদের মনে হয়—যা তোমাদের ধর্ম্মে বলে, তাই কোরো।"

হরেকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না ; এমন হৃদয়-

হীন প্রস্তাবে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "যে সমাজ-রক্ষার জন্য, যে মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য এত গর্হিত কাজ করতে হবে, এত মিথ্যা, ছল, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হবে, সে সমাজ, সে মান-সম্ভ্রম কি এত স্পৃহণীয় দাদা!"

"হাঁ, স্পৃহণীয়। যতদিন সমাজে বাস করতে চাইবে, ততদিন এই সবই করতে হবে। তুমি একা এ কাজ করছ না, তোমার পূর্ব্বে অনেকে করেছেন,—এখনও কতজন করছেন।"

হরেকৃষ্ণ কাতর ভাবে বলিলেন "দাদা, অপরাধ নেবেন না। এতকালের মধ্যে কোন দিন আপনার অবাধ্য হই নাই; যখন যা আদেশ করেছেন, পালন করেছি। কোন দিন আপনি কোন অন্যায়, অনুচিত আদেশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আজ আপনার এ আদেশ আমার কাছে অন্যায়, অসঙ্গত,—যদি অপরাধ না নেন, তবে বলি—নৃশংস বলে মনে হচ্চে। এ আদেশ পালন করতে আমার মন অগ্রসর হচ্চে না। আপনি এতকাল আমাকে যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, যে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, যে কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য আদেশ করেছেন, আপনার আজকার আদেশের সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্য নাই। এমন কঠোর বিধান যে আপনার মত জ্ঞানী, ধর্ম্মপরায়ণ দেবতার মুখ দিয়ে বের হবে, এ কথা আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আপনার সম্মুখে এত কথা আমি কোন দিন বলি নাই; কিন্তু আজ প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম। আমি আপনার এ আদেশ পালন করতে একেবারে অসমর্থ।"

"তা হলে তুমি কি করতে চাও? তোমাকেই ত কর্ত্তব্য স্থির করতে অনুরোধ করেছিলাম; তুমি ত কোন কথাই বল্‌তে পারলে না—কোন পথই দেখিয়ে দিতে পারলে না।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "এতকাল পরামর্শ শুনেই এসেছি, কোন দিন ত পরামর্শ দেবার সাহস বা স্পর্দ্ধা আমার হয় নাই দাদা!"

"কোন দিন ত এমন ঘটনাও উপস্থিত হয় নাই ভাই!" হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি একটা কথা বল্‌তে চাই। আপনার বয়স হইয়াছে, আমি বলি কি, আপনি বড়বৌ ও লক্ষ্মীকে নিয়ে কাশীবাস করতে যান। সংসার-ধর্ম্ম ত অনেক করেছেন—এখন কাশীতে যান। সেখানে অভাগীকে নিয়ে বাস করুন। সে বিদেশ, সেখানে কে কার খোঁজ নেবে। সেখানে সমাজেরও ভয় নাই। আপনি সেখানে গিয়ে বাস করুন। এদিকে যা করে গিয়েছেন, তার থেকে আমি আপনাদের কাশীবাসের খরচ বেশ চালিয়ে নিতে পারব।"

"তারপর।"

"তারপর লক্ষ্মীর কথা বল্‌ছেন। লক্ষ্মীকে পাপে ডুবিয়ে কাজ নেই। এই শেষ বয়সে এমন মহাপাতকভাগী আপনি হবেন না। এখনও সময় আছে।"

"তারপর"

"তারপর—তারপর লক্ষ্মী যে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে, তা আমার বোধ হয় না। তার যে শরীরের অবস্থা,

তাতে শেষ সময়ে খুব সম্ভব, তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তখন তাকে মা গঙ্গার কোলে ফেলে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।"

"আর তা যদি না হয়।"

"যদি না হয়, তখন তার উপায় করা যাবে। সে জন্য আপনি ভাববেন না। সে ভার আমার উপর রইল। সমাজের মুখ চেয়ে পাপের কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে আমি আপনাকে দেব না।"

বড় কর্ত্তা অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভাই হরেকৃষ্ণ, তোমার পরামর্শই ঠিক। অভাগিনীকে নিয়ে আমিই বনবাসী হব। তুমি কি মনে করছ ভাই, আমার হৃদয়ে দয়া মায়া নেই। লক্ষ্মী যে আমার কত আদরের, কত যত্নের ধন, তা কি তুমি জান না। সে যদি কুপথগামিনী হোত, স্বেচ্ছায় সে যদি পাপের পথে যেত, তা হলে তাকে আমি দূর করে দিতে পারতাম; কিন্তু তার ত কোন অপরাধ নেই। অসহায় বালিকা নিশ্চয়ই প্রাণপণে পাষণ্ডদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। তারপর যা হবার, তাই হয়েছে। এ সব কথা কি আমি বুঝতে পারছি নে। লক্ষ্মীকে পথের ভিখারিণী করবার পরামর্শ দিতে কি আমার বুক ফেটে যায় নি ভাই! কিন্তু কি করব—সমাজের দিকে চেয়ে সব সইতে প্রস্তুত হয়েছিলাম; অধর্ম্ম কার্য্য করতে অগ্রসর হয়েছিলাম। এখন ভেবে দেখলাম, তোমার পরামর্শই ঠিক। আমি কাশীবাসীই হব—হতভাগিনী কন্যাকে বুকে করে আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণেই শরণ নেব। তিনি ত অন্তর্য্যামী, তিনি ত সবই দেখতে পাচ্ছেন। আমার লক্ষ্মী যে

প্রকৃতই লক্ষ্মী, তা কি সেই [illegible]
তাঁরই উপর নির্ভর করব।
আমি কি করতে পারি? দুইভাই মিলে কি অসহায়া [illegible]
পাষণ্ডদের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম ভাই। তাদের হাতে পড়ে লক্ষ্মী আমার যখন 'বাবা' বলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, তখন কি সে কাতর আহ্বান শুন্‌তে পেয়েছিলাম। যাক্ সমাজ যাক্ সব—আমি লক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে পারব না। আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব—সমাজের বাইরে চলে যাব। তুমি ঠিক কথা বলেছ, তোমার উপদেশই ঠিক উপদেশ। ভাই হরেকৃষ্ণ, এত দিন তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, আমি মোহে অন্ধ হয়ে তা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আজ তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে—তোমার দাদাকে মহাপাতকের হাত থেকে রক্ষা করলে। আমার শিক্ষাদান বৃথা হয় নাই। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত এমনই ভাবে, যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, তাহার জন্য তুমি যেন বীরের মত দাঁড়াতে পার, অন্যায় আদেশ,—তা স্বয়ং গুরুদেব করলেও, দাদা ত সামান্য মানুষ—তা অস্বীকার করবার মত মনের বল তোমার হয়েছে। এত কষ্টের মধ্যে, এত বিপদের মধ্যেও এই কথা মনে করে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে, তা তোমাকে বলে উঠ্‌তে পারছি নে। বেশ, তুমি আয়োজন কর, ব্যবস্থা কর; দিন ক্ষণ আর দেখ্‌তে হবে না; যেখানে যা আছে, সবই তুমি জান। আরও যদি কিছু জানবার থাকে, জেনে নেও। সকলকে বল, আমি এই শেষবয়সে কাশীবাসী হব।"

৮

পরদিনই গ্রামের সকলে শুনিল যে, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। প্রতিবেশী বৃদ্ধ মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সংবাদ পাইবামাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; বড় কর্ত্তা ও হরেকৃষ্ণ তখন বাড়ীতেই ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রাম, শুনে বড় সুখী হলাম যে, তুমি কাশী যাচ্ছ। অতি উত্তম সঙ্কল্প করেছ। আমাদের অদৃষ্টে ত নেই, আমাদের এই কাঞ্চনপুরের মাটী ধরেই থাক্‌তে হবে। অদৃষ্টে না থাক্‌লে কি হবে বল। এখনও অন্নচিন্তা গেল না। মনে করেছিলাম, ছোটটা বড় হোলো, যা হোক কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখ্‌ল; দুপয়সা নিয়ে আস্‌বে, সংসারের ভার নেবে। সব আশাই বিফল হোলো। কাজকর্ম্ম কিছুই করবে না, সুধু খাবে, বেড়াবে, আর বাবুগিরি করবে। আরে, সে বাবুগিরির পয়সা যে কোথা থেকে আস্‌বে, তা ত ভাবে না। কিছু বল্‌বারও যো নেই—জান ত রাম, তোমার জেঠীমার স্বভাব,—একটু কিছু বল্‌তে গেলেই তিনি একেবারে জ্বলে ওঠেন, বলেন, 'সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ছয়মেয়ের মধ্যে ঐ একটা মাত্র ছেলে, ওকে কিছু বল্‌তে

পারবে না', অমনি করেই ছেলেটার মাথা তিনি খেলেন। আর এই বুড়ো বয়সে কোথায় ঠাকুর-দেবতার নাম করব, তীর্থধর্ম্ম করব,—না, অন্নচিন্তাতেই দিন কেটে যায়। তা তোমার ও-সব বালাই নেই; লক্ষ্মণের মত ভাই, অমন ছেলে আমাদের এ অঞ্চলে নেই। তারপর ঐ একটী মেয়ে; একটা দেখেশুনে বিয়ে দিতে পারলেই আর চাই কি। তা বেশ সঙ্কল্প করেছ। এদিকে ত দেখ্‌লে, চেষ্টাও করলে, কোন সুবিধে হোলো না। কাশীতে যাও, সেখানে দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর লক্ষ্মীর শরীরও খারাপ হয়েছে; এখানে ত অনেক চিকিৎসাপত্র করলে; কিছুই হোলো না। স্থান-পরিবর্ত্তনে ওর শরীরও অমনিই সেরে যাবে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সেইজন্যই ত কাকা আরও তাড়াতাড়ি করছি; নইলে আরও কিছুদিন পরেই যেতাম।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, না, ও সব সৎকার্য্যে কি দেরী করতে আছে। মনে যখন হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ যখন সুমতি দিয়েছেন, তখন আর কালবিলম্ব করো না—শুভস্য শীঘ্রম্।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কাকা, হরেকৃষ্ণ ছেলেমানুষ; বয়স ৩২ বছর হলে কি হয়, এখনও ওকে আমি ছেলেমানুষ মনে করি। ওকে সর্ব্বদা দেখ্‌বেন; আপনার উপর ওর ভার দিয়ে গেলাম।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সেজন্য তুমি ভেব না রাম, এই ত এতদিন দেখে আসছি, হরেকৃষ্ণই ত ইদানী সবই করছে। জমিজমা দেখাশুনো, শিষ্যযজমান রক্ষা—সে সবই ত এখন হরেকৃষ্ণই

করে ; তুমি আর কত দেখ্‌তে পার। সে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা আছি ; বিপদ-আপদে সবাই বুক দিয়ে পড়বে। তুমি ত আর কিছুরই অসদ্ভাব রেখে যাচ্ছ না ! যা জমিজমা আছে, তাতে বেশ চলে যায়, তা ছাড়া যা শিষ্যযজমানও ত কম নেই ;—তোমার অভাব কি বল ?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ করবেন, হরেকৃষ্ণ যেন সব চালিয়ে নিতে পারে। ঘরে ত আর দুশ পাঁচশ মজুত নেই ; আপনাদের আশীর্ব্বাদে কোন রকমে দিন চলে যায়, এইমাত্র।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,"কাশীতে তোমাদের তিনটি মানুষের খরচও ত নিতান্ত পক্ষে মাসে ত্রিশটাকার কম হবে না।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন "হাঁ, মাসে ত্রিশটাকা করেই পাঠিয়ে দেব স্থির করেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তা, সে আর বেশী কি ? তোমাদের যে সব শিষ্য আছে, তাদের মধ্যে এমনও দুই চার জন আছেন, যারা আনন্দের সঙ্গে এই কাশীবাসের খরচ দিতে রাজী হবে। তুমি যে কাশী যাবার ইচ্ছে করেছ, এ সংবাদ শিষ্যদের জানানো উচিত।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "সে কথা আমিও ভেবেছি। আজই সকলকে চিঠি লিখ্‌ব ; নইলে তারা মনে কষ্ট করবে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সকলকেই একবার আস্‌তে লিখে দিও। যাবার সময় সকলকেই আশীর্ব্বাদ করে যেতে হবে ; তারা আমাকে বড়ই ভক্তি করে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি ত আর পেশাদার গুরুগিরি কর না; তুমি শিষ্যদের যথেষ্ট ভালবাস, তাদের মঙ্গলকামনা কর, তাই তারা তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। এখন যে সব গুরু দেখ্‌তে পাও, জান হরেকৃষ্ণ, তারা লেখাপড়া জানে না, শাস্ত্রজ্ঞান ত মোটেই নেই, অনেকে এমন দুশ্চরিত্র যে, তাদের নাম মনে হলেও ঘৃণা হয়; এদিকে শিষ্যের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের ফিকির খুব জানে। তাতেই ত এখানকার শিষ্যদের গুরুভক্তিও কমে যাচ্ছে। তুমি ত তেমন নও।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমি এ জীবনে কখন কোন শিষ্যের কাছে কিছু চাই নাই; যে যা দেয়, তাই হাসিমুখে নিই। এই সেবার গোলোক করের মাতৃশ্রাদ্ধে গেলাম। গোলোকের অবস্থা বেশ ভাল; খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করল। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এমন ব্যবহার করতে লাগল যে, দেখে আমার লজ্জা হোতে লাগ্‌ল;—সুধু দেও, আর দেও,—আর এটা ভাল হয় নাই, ওটা ভাল হয় নাই, বলে বিরক্তি প্রকাশ। এতে শিষ্য-যজমানের আর ভক্তি থাকে কি করে? এই পুরোহিত আবার এমনই নির্লজ্জ, যে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগ্‌ল, আমি যেন সব বেশী বেশী করে দিতে বলি। তা, কাকা, আপনার আশীর্ব্বাদে অত লোভ আমার নেই; আমি বরঞ্চ তাদের নিরস্ত করতে লাগলাম। গোলোক যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এত দিল, পুরোহিতকে যথাতিরিক্ত দিল, তবু তাদের মন উঠল না। আর আমাকে যা দিল, আমি তাই যথেষ্ট বলে হাসিমুখে গ্রহণ করলাম।

দেখ, হরি, গোলোক করকে ভাল করে একখানা চিঠি লিখে দিও, সে যেন অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করে যায়। তার উপর অনেক ভার দিয়ে যেতে হবে।”

যখন এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন আরও দুই চারি জন গ্রামস্থ লোক আসিলেন। স্বরূপ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “রাম দাদা, তুমি সত্যই কাশী চল্‌লে। আর কিছু দিন পরে গেলেই হোতো। গ্রামের অবস্থা ত দেখ্‌ছ; তোমরা দুচারজন আছ, তাই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তা তুমি কি একেবারে বাস করবার জন্যই যাচ্ছ, না তীর্থ করেই ফিরে আস্‌বে। মেয়েটার বিবাহ শেষ করে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেই পার্‌তে।”

বড় কর্ত্তা বলিলেন, “সে বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছে; তিনি যদি দয়া করে স্থান দেন, তা হলে ঐ চরণ তলে পড়ে থাকব। মেয়ের বিয়ের ত কোন কিছুই করে উঠ্‌তে পারলাম না; তাই তাকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি; দেখি কাশীতে যদি কিছু করতে পারি।”

স্বরূপ বলিলেন, “তা হলে লক্ষ্মীকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ; আমি মনে করেছিলাম, তাকে রেখে যাবে।”

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “একলা বৌমা কি করে যাবেন; মেয়েটা কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হবে, আরাম ব্যারাম আছে ত।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “লক্ষ্মীর শরীর বড় খারাপ হয়েছে, ডাক্তার কবিরাজ ত কিছুই করতে পারল না; তাঁরাই বল্‌লেন স্থান

পরিবর্ত্তনে শরীর ভাল হতে পারে; সেই জন্যই দাদাকে তাড়াতাড়ি কাশী যেতে হচ্ছে।”

কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা সকলেই অনুমোদন করিলেন, ইহাতে হরেকৃষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন; প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে কাহারও মনে যে সামান্য সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নাই, ইহাতেই তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরাও যে এ বিষয়ে কোন প্রকার বাদানুবাদ করিলেন না, ইহাও পরম সৌভাগ্য বলিয়া হরেকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত হইলেন। পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁহার তত ভয়ের কারণ ছিল না; কিন্তু পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বড় সহজে, ভাল ভাবে কোন কথা গ্রহণ করেন না; পাছে তাঁহারা লক্ষ্মীর অবস্থা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া এই হঠাৎ কাশী যাওয়ার কথা লইয়া একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বসেন, এই ভয়ই হরেকৃষ্ণের মনে প্রধান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না দেখিয়া তিনি আপাততঃ শান্তি বোধ করিলেন। তাহার পর;—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেকৃষ্ণ মনে মনে বলিলেন, “তাহার পর, যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হইবে। হায় অভাগী লক্ষ্মী! কোন্ প্রাণে তোকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেব মা! বাবা বিশ্বনাথ! লক্ষ্মীকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর! তাকে যেন আবার ঘরে ফিরে আন্‌তে পারি।” কিন্তু কেমন করিয়া সে আশা সফল হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াও তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইল।

সেই দিনই শিষ্যদিগকে পত্র লেখা হইল; কাশী যাওয়ার দিন স্থিরও হইয়া গেল। তিন চারিদিন পরেই অনেক শিষ্য আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ বা কার্য্যানুরোধে আসিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং যথাশক্তি প্রণামী পাঠাইয়া দিলেন। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারাও যথেষ্ট প্রণামী দিলেন। গোলোক কর সংবাদ পাওয়ামাত্রই গুরু-পদ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং আরও কিছুদিন কাশী যাওয়া বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আমারও বয়স হয়েছে। এতদিন ত বিষয় নিয়েই কাটালাম; এখন আমারও ইচ্ছা যে, বাকী কয়টা দিন কাশীতেই কাটাবো। কিন্তু আপাততঃ যাওয়ার অনেক বিঘ্ন। বিষয়-আশয়, কাজকর্ম্মের একটা বিলি-ব্যবস্থা করা ত চাই। ছেলে দুইটীকে ত এতদিন যা হয় লেখাপড়া শিখালাম, এখন কিছুদিন কাছে বসিয়ে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে না গেলে, তারা কি এ-সকল রক্ষা করতে পারবে। আপনি আর বছর খানেক অপেক্ষা করুন; তা হলেই আমিও আপনার সঙ্গী হতে পারব এবং শেষ কালটা বিশ্বনাথ দর্শন করে, আর আপনাদের সেবা করে জীবন সার্থক করতে পারব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তা ত হয় না গোলোক! মনে যখন বাসনা হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ যখন দয়া করেছেন, তখন আর বিলম্ব করা যায় না। কিছুই ত বলা যায় না, মন না মতি। কখন কি মন হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে।"

গোলোক বলিলেন, "সে কথা ঠিক বলেছেন ঠাকুর মহাশয়! তবে কি জানেন, ছোটঠাকুর মহাশয় ত আর এ সব ছেড়ে,

আমাদের ছেড়ে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। বিদেশে সেবার কষ্ট হবে। আমরা যদি সঙ্গে থাকি, তা হলে সেবা যাতে হয়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে পারতাম। এই যা আপত্তি।"

"না গোলোক, তুমি সে আপত্তি কোরো না। দেখ, তোমাকে বিশেষ করে আস্‌তে লিখেছিলাম কেন জান? আমার শিষ্যদের মধ্যে তুমিই ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভাগ্যবান হয়েছ। হরেকৃষ্ণ এখনও সংসারের কিছুই জানে না; দাদার আড়ালে থেকেই সে এতদিন কাটিয়েছে। তাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তুমি সর্ব্বদা তার উপর দৃষ্টি রেখো; বিপদ-আপদে মাথা দিয়ে দাঁড়িও; তার যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে তোমাকেই দেখ্‌তে হবে। যাতে তার সব দিকে ভাল হয়, তা তোমাকেই করতে হবে। সে যাতে সব ভার বইতে পারে, তার উপযুক্ত তাকে করে দিতে হবে। আর—"

গোলোক বাধা দিয়া বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, এ সংসার ছোট-ঠাকুর মহাশয় একা বইবেন কি করে? আমাকেও ত সংসারের কিছু ভার দিলে পারতেন।"

বড় কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার উপর যে গুরুতর ভার দিয়ে যাচ্ছি গোলোক! তোমার গুরুবংশের মান-সম্ভ্রম, ভরণ-পোষণ সমস্ত ভারই যে তোমার উপর রইল।"

"না, ঠাকুর মহাশয়, আপনি ত কোন ভারই আমাকে দিলেন না। এই ত এতকাল দেখে আস্‌ছি; কোন দিন ত এ কথা বল্‌তে শুনলাম না, 'গোলোক, আমার এই অভাব হয়েছে, তুমি

তার ব্যবস্থা কর’। কৈ, এমন কথা ত এক বারও আপনি বলেন নাই। ছোটঠাকুর মহাশয় আপনারই ভাই। তিনিও কিছু বল্‌বেন না, বা জানাবেন না, এ আমি ঠিক জানি। সেবার আমার স্ত্রী এসে নূতন একটা কোঠা করে দেবার জন্য কত অনুরোধ করলেন; আপনি বললেন, ‘যা আছে, তাতেই বেশ চলে যাচ্ছে, আর কোঠা কেন? হরেকৃষ্ণের ছেলেপিলে হলে যখন স্থানের অকুলন হবে, তখন করে দিও’। কেমন, এই ত আপনার কথা। তা হলে আর প্রকৃত ভার কি দিলেন। যাক্ সে কথা; আমি বলি কি, এই যাওয়ার যা খরচ—এটা ছোটঠাকুর মহাশয় দিতে পারবেন না, আমি দেব। আর মাসে-মাসে কাশীতে যে খরচ হবে, তাও আমাকে দেবার অনুমতি করে যান। ছোটঠাকুর মহাশয়ের উপর এত ভার চাপাবেন না।”

বড় কর্ত্তা বলিলেন, “গোলোক, তুমি যা বল্‌ছ, সে তোমারই মত লোকের উপযুক্ত কথা; কিন্তু তোমাদের কল্যাণে, তোমাদেরই ভক্তির জোরে, হরেকৃষ্ণ অনায়াসে এ সব করতে পারবে। তুমি ভেবে দেখ, আমরা চাকরী করি না;—তোমরা যা দেও, তাতেই চলে। হরেকৃষ্ণ যা দেবে, সে কি তার টাকা, না সে তোমাদেরই দত্ত টাকা। তবে আর পৃথক করে দিতে চাইছ কেন? এই এখনই ত বলেছি, হরেকৃষ্ণের উন্নতির ভারই তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি। পাথেয় দিতে চাইছ। আমার অন্য শিষ্যরা এসেছিলেন, এই রামকুমার দত্ত, শিরোমণি বসু, রসিক পাল তোমারই পাশে বসে আছে। এদের অবস্থা তোমার মত না হ’লেও বেশ সচ্ছল।

এরাও আমার শিষ্য ; এরাও আমার ভার নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমি কাকে রেখে কার কাছে চাইব। তুমি বিশেষ সম্পন্ন, তাই তোমার উপর বড় ভার দিলাম ; এরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, এঁরা প্রাণ দিয়ে হরেকৃষ্ণের কাজ করবে। এরা সবাই যে প্রণামী দিয়েছে, আরও দেবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তা কম নয় ; তাতে আমার পাথেয় কেন, অনেক দিনের খরচ চলে যাবে। সুতরাং সেজন্য তুমি ব্যস্ত হোয়ো না।"

গোলোক হরেকৃষ্ণর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোটঠাকুর মহাশয়, কাশীর খরচ মাসে কত করে স্থির করলেন?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "মাসে ত্রিশটাকা হিসাবে দিতে হবে।"

গোলোক বলিলেন, "মাসে ত্রিশটাকা ; তা হলে হোলো বছরে তিনশত ষাট টাকা ;—ধরা যাক্, বছরে চারশত টাকা। দেখুন ছোটঠাকুর মহাশয়, মানুষের শরীরের কথা বলা যায় না। এই আমি আছি, দশদিন পরেই হয় ত মারা যেতে পারি,কেমন? তার পর ছেলে-পিলেরা থাক্‌বে ;—তাদের কার কেমন মতি হবে, তারই বা ঠিকানা কি? আমি বলি কি, আমি কালই বাড়ী গিয়ে ঠাকুর মহাশয়ের তিন বছরের খরচ তিন-চেরে বারশত টাকা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি সেই টাকাটা ডাকঘরে জমা রাখ্‌বেন। তার থেকে মাসে-মাসে ঠাকুর মহাশয়ের খরচ পাঠিয়ে দেবেন। তার বাড়া যা লাগ্‌বে, তা এই রামকুমার দা আছেন, ঐ বোস মশাই আছেন, আরও অনেকে আছেন,—সকলকেই ত আমি জানি,—এঁরা দেবেন। তাঁদের গুরুসেবা থেকে আমি বঞ্চিত

করব কেন ? আমার না হয় দুটো পয়সা আছে, কিন্তু ভক্তিতে এঁরা আমার চাইতে কম নন ! কি বলেন ? দাদার দিকে চাইতে হবে না। ওঁকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি। স্বর্গীয় গুরুঠাকুর (গোলোক তাঁহার উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিলেন) যখন ওঁকে নিয়ে আমাদের বাড়ী পদধূলি দিতেন, তখন উনি এই আঠারো উনিশ বছরের ছেলে ; আমার বয়স তখন আর কত—এই তেইশ চব্বিশ। তখন থেকেই দেখে আস্‌ছি, ওঁর লোভ বলে কিছু নেই। আর এতকাল তাই দেখ্‌লাম। ঐ পায়ের ধূলোর জোরেই ত গোলোক কর পাচ টাকার মুহুরিগিরি থেকে এত বিষয়-আশয় করেছে। ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। উনি ত সব মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন ; এখন আপনাতে-আমাতে কথা, কি বল রামকুমার দাদা !”

রামকুমার দত্ত বলিলেন, “সে ত ঠিক কথা।”

শিরোমণি বসু বলিলেন, “কর মশাই, ছোটঠাকুর আবার বড় ঠাকুর মশাইয়ের বাড়া। শুন্‌বেন ওঁর কীর্ত্তির কথা। এই বছর তিনেক আগে একবার উনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন। আমি মনে করলাম, কাল শুদ্ধ আছে, পুত্র-পুত্রবধূর মন্ত্র নেওয়াটা সেরে নিই। তারই আয়োজন করলাম ! অবস্থা ত ভাল নয় ; কোন রকমে কাজ শেষ করলাম। দিলাম অতি সামান্যই ; এই খান-তের-চোদ্দ ছোট-বড়, অতি কম দামের কাপড় ; বাসনপত্রও তেমনি ; আর প্রণামী বুঝি গোটা ত্রিশেক টাকা। উনি তাতেই মহা সন্তুষ্ট। আরও অনেকের গুরু ত

দেখেছি। ওরে বাবা, কি তেজ, কিছুই তাঁদের মনে ধরে না। যাক্ সে কথা। ফিরবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে বল্লেন, কাল সকালে আহারান্তেই যাত্রা করব। তাই ঠিক হোলো। সকালে সঙ্গের লোকটাকে জিনিষপত্রগুলো বুঝিয়ে বেঁধে-ছেঁদে দিলাম। উনি প্রাতঃকালে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বল্লেন 'বোস দাদা, আজ আর আমার যাওয়া হবে না, কাল খুব ভোরে যাব।' শুনে আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। বিকেল বেলা দেখি, সঙ্গের লোকটার মাথায় কাপড়ের মোট দিয়ে ঠাকুর বাইরে যাচ্ছেন। আমি বল্লাম 'ও ঠাকুর ভাই, এই না বল্লেন, কা'ল সকালে যাবো, আবার এখনই না ব'লে-কয়ে যে চলেছেন।' উনি হেসেই বল্লেন 'না, যাচ্ছিনে, একটু বেড়িয়ে আসি।' আমি বল্লাম 'বেড়াতে যাবেন, তাতে কাপড়ের মোট সঙ্গে কেন?' উনি বল্লেন 'একটু দরকার আছে।' দরকারটা কি, তাই দেখবার জন্য আমিও সঙ্গ নিলাম। আমাদের গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায় অনেক দুঃখী লোকের বাস; তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে এসেছিলেন। সেখানে গিয়ে করলেন কি, সকলকে ডেকে কাপড়গুলো বিলিয়ে দিলেন; আর সঙ্গে যে টাকা ছিল, সব দিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। আমি ত অবাক্।"

রসিক পাল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "উনি ব'লে নয়, এ বাড়ীর সবাই সমান। সেবার আমার স্ত্রী এখানে এসেছিলেন। তিনি গিয়ে গল্প করলেন যে, বড়ঠাকুর মশাই ত কিছুই দেখেন না; ছোটঠাকুর মশাই আর বড়

মা ঠাকরুণই সব করেন। যেমন ছোটঠাকুর মশাই, তেমনি মা ঠাকরুণ, আবার তেমনি মেয়েটী। ঘরে কিছু থাকবার যো নেই। আমার স্ত্রী বল্‌লেন, গরীব দুঃখীর উপর তাঁদের কি দয়া! তাইতেই ত কিছুই জমে না, সব খরচ হয়ে যায়।"

বড় কর্ত্তা সহাস্যে বলিলেন, "জমে না কি রসিক! এই যে সব তোমরা জমেছ; তোমরা এক-একজন যে আমার লাখ-টাকার সম্পত্তি। আমি এর চাইতে বেশী কি জমাব! দরকার কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, হরেকৃষ্ণ যেন এমনই করেই দিন কাটাতে পারে।"

গোলোক কর বলিলেন "তা হলে আমি সামান্য যা কিছু এনেছি, তা আর ঠাকুর মশাইকে প্রণামী দেব না, অমনিই আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাব। আমি বড়-মাঠাকরুণকে, আর লক্ষ্মীকেই প্রণামী দিয়ে যাই।"

গোলোক কর এবং আরও দুই একজন বড় কর্ত্তার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পরদিন চলিয়া গেলেন; দুই তিনজন ঠাকুর মহাশয়ের যাত্রার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাইবেন বলিলেন।

৯

কাশী-যাত্রার দিন নিকট হইতে লাগিল। গোলোক কর বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বারশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ তাহার মধ্য হইতে হাজার টাকা পোষ্টাফিসে জমা দিয়াছেন; বাকী দুইশত টাকা হাতে রাখিলেন; অভিপ্রায় এই যে, এই টাকাটা তিনি বড় বৌয়ের হাতে গোপনে রাখিয়া দিবেন—বিদেশে হঠাৎ যদি কোন দরকার হয়, বা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই টাকা কাজে লাগিতে পারে। অন্য শিষ্যদের নিকট যাহা প্রণামী পাইয়াছিলেন, তাহাও হিসাব করিয়া দেখিলেন, নিতান্ত কম নহে—প্রায় সাড়ে তিন শত টাকা। হরেকৃষ্ণ এই টাকা হইতে দুইশত টাকা গ্রামের রাঘব পোদ্দারের দোকানে জমা রাখিলেন—গোলোক করের টাকাটা সমস্তই দাদার খরচের জন্যই রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য। পোষ্ট-আফিস হইতে টাকা তুলিতে গেলে দশদিন বিলম্বও হইতে পারে; রাঘব পোদ্দারের কাছে কিছু টাকা থাকিলে, যখন দরকার হইবে, তুলিয়া লওয়া সহজ। দাদার পথ-খরচের জন্য দেড় শত টাকাই আপাততঃ যথেষ্ট;—আর যদি কমই পড়ে, তাহা হইলেও বড়বৌয়ের নিকট ত টাকা থাকিল।

এদিকে যাত্রার সমস্ত আয়োজনই চলিতে লাগিল। হরেকৃষ্ণ দাদার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ছোটবধূকে কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, তিনিও দাদার সঙ্গী হন। দাদাকে কাশী পৌঁছাইয়া দিয়া, সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার দাদা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; তিনি বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ, তুমি ত কখন ও-সব দেশে যাও নাই; তুমি আর বিশেষ কি সাহায্য করবে; বিশেষতঃ, বাড়ীতে নারায়ণ আছেন। অন্যের উপর তাঁহার সেবার ভার দিয়া যাওয়া আমি ভাল মনে করি না—সেবাপরাধ বড় গুরুতর অপরাধ।" সুতরাং হরেকৃষ্ণের দাদার সঙ্গী হওয়া হইল না। তিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত দাদার যাহা কিছু দরকার হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বড় গিন্নী কেমন যেন হইয়া গেলেন; তাঁহার আর হাত-পা উঠে না; সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার কেমন একটা উদাসীন ভাব। এ যে তীর্থযাত্রা নহে,—এ যে বিশ্বনাথ দর্শনের বাসনা নহে,—এ যে বনবাস—এ যে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার চিরজীবনের জন্য বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা, তাহা কি তিনি ভুলিতে পারেন? ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কোথায়, কোন্ নির্ব্বান্ধব স্থানে যাইতেছেন;—সঙ্গে তাঁহার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, দক্ষিণ হস্ত হরেকৃষ্ণ থাকিবেন না;—কেমন করিয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ছোট বৌ লক্ষ্মীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ছোট-বৌয়ের বয়স এই একুশ বৎসর। লক্ষ্মীকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। লক্ষ্মী তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইলেও বয়সের বিশেষ তারতম্য না থাকায়, দুইজনে সখীর ভাবে এতকাল কাটাইয়াছেন। ছোটবধূ বেশ লেখাপড়া জানিতেন; তাঁহার পিতা বিক্রমপুর অঞ্চলের একজন প্রধান অধ্যাপক।

ছোট-বৌ লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, আমাদের ছেড়ে চল্‌লে মা! এ জীবনে আর কি তোমাকে দেখ্‌তে পাব। তোমাদের ছেড়ে কি করে যে থাক্‌ব, তাই ভাবছি, আর কান্না পাচ্ছে। এমন সর্ব্বনাশ কে করলে? আমাদের এমন সুখের সংসারে কে এ আগুন জ্বেলে দিলে? আর কি কোন উপায় ছিল না, মা-লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী বলিল, "কাকীমা, সবই ত তুমি জান; তোমার কাছে ত কিছুই গোপন করি নাই। বাবা কাকা যা করতে চেয়েছিলেন, তাতে বাধা দিয়ে কি আমি অন্যায় কাজ করেছি কাকীমা?"

"না, তুমি কোন অন্যায় কাজ কর নাই। কিন্তু সব যে গেল। তোমাকে যে জন্মের মত হারাতে হোলো।"

"এ ছাড়া আর পথ নেই। আমি অনেক ভেবেই এ পথ ধরেছি। শোন কাকীমা, মন খুলে কথা বল্‌বার লোক আর আমি পাব না; তুমিই আমার ব্যথা বোঝ কাকীমা, তোমাকেই

বলি। আমি এতদিন ধরে কত কথা ভেবেছি। দেখ, আমি আর কুমারী নই, সধবাও নই,—বিবাহ ত আমার হয় নাই,—অথচ আমার মনে হয় আমি বিধবা। আমি চির-জীবন এই বৈধব্যই পালন করব। আমি কাহারও ধর্ম্মপত্নী নই,—কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী নই। তুমি পণ্ডিতের মেয়ে, তুমি শাস্ত্র জান;—তুমিই বল আমার অবস্থা কি? আমি জেনে রেখেছি, আমি একজনের পত্নী—এক রাত্রির সামান্য সময়ের জন্য আমি একজনের কাম-পত্নী হয়েছিলাম;—ইচ্ছায় হই নাই—সজ্ঞানে হই নাই—অজ্ঞান অবস্থায় একজনের কাম-পত্নীর কাজ আমাকে করতে হয়েছে। তাহার পরক্ষণেই আমি বিধবা হয়েছি। শাস্ত্রে কি বলে জানিনে; কিন্তু এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি চির-জীবন এই বৈধব্য পালন করব;—এ জীবনে আমি পরপুরুষের চিন্তা কোন দিন মনে আনি নাই;—আর আনিবও না। আমার গর্ভে যে এসেছে, সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তাকে রক্ষা করতে আমি বাধ্য। যে ইহার জন্মদাতা, তাকে চিন্‌তে পারি নাই—জান্‌তে পারি নাই। কত জনের কথা মনে করেছি,—কতজনকে এই সন্তানের জন্মদাতা ব'লে সন্দেহ করে পাপ-ভাগিনী হয়েছি। কি করে চিন্‌ব বল কাকীমা!—তা, না চিন্‌লাম, না জান্‌লাম, না পরিচয় পেলাম;—কিন্তু একরাত্রির জন্য,—কয়েক ঘণ্টার জন্য—জানি না, হয় ত কয়েক মুহূর্তের জন্য, একজনের কাম-পত্নী হয়েছিলাম, এ কথা ত ঠিক। অজ্ঞানেই হোক না কেন, একজনের কাছে ত দেহ দিতে হয়েছিল। তারই

ফল এই সন্তান। তাকে আমি বধ করবার অধিকারী নই—কিছুতেই নয়। সেইজন্যই আমি লজ্জা-সরম ত্যাগ করে, এই পাপকার্য্যে সম্মতি দিই নাই। আমি ত কাকীমা, ধর্ম্মভ্রষ্ট হই নাই; আমি ত স্বেচ্ছায় কারও সেবা করি নাই;—আমি কামনা-বাসনার দাসীত্ব করি নাই। আমি কাকীমা, কলঙ্কিনী নহি। সমাজ যা বলুক—লোকে যা বলুক, আমি ত আমার নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই নাই;—আমার গর্ভের সন্তান ত আমার কলঙ্কের সাক্ষ্য নয় কাকীমা! আমি মনে-প্রাণে কাহারও ধর্ম্মপত্নী নহি; এ জীবনে আমি আর সে বাসনা রাখি না। সেই রাত্রির পরেই আমি চির-বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করেছি। আর তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, সমাজ আমাকে কি বলে অপরাধিনী করতে পারে? হিংস্র জন্তুতে আমাকে আক্রমণ করে, আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছিল;—তাতে কে আমাকে অপরাধিনী করতে পারে? আমি তখন অসহায়া,—আমার তখন আত্মরক্ষার শক্তি-সামর্থ্য ছিল না,—আমি তখন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। ইহার মধ্যে আমার অপরাধ কোথায়? তবে তার জন্য আমার উপর তোমরা কঠিন দণ্ড দিতে চাও কেন? আমি সে দণ্ড মাথা পেতে নিতে যাব কেন? পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে আমার আজ এই দশা হোলো। আবার তাকে বাড়াতে যাব কেন? সমাজের কথা বল্‌বে। তুমি সমাজের সকলকে ডেকে আন,—আমি মুক্তকণ্ঠে আমার কাহিনী তাঁদের কাছে বল্‌তে পারি। তার পর, তাঁরা বিচার করুন। তাঁরা বলুন, কোন্ খানে আমার অপরাধ? তবে

আমি আরও পাপের বোঝা মাথায় করতে যাব কেন? আমি ত কোন পাপের কাজ করি নাই। দণ্ড দিতে হয়, তাকে দেও, যে আমার জীবন এমন করে বিফল করে দিল। সেই জন্য আমি পাপকার্য্যে মত দিই নাই। যা থাকে আমার অদৃষ্টে, তাই হবে। তোমরা আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করছ, কর; এতে আমার কষ্ট হচ্ছে বটে; তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে বটে; কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা কাকীমা, আমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি চির-জীবন এই স্পর্দ্ধা নিয়ে কাটিয়ে যেতে পারি;—আমার নারীত্বের গর্ব্বই আমাকে রক্ষা করবে।"

ছোট-বৌ বলিলেন, "লক্ষ্মী, তোমার কথা সবই ঠিক—তুমি আমাদের সেই লক্ষ্মীই আছ। তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দিতে পারে, কার সাধ্য। সে সব কথাই মানি। কিন্তু সমাজের দিকে চাইলে, একটা কথা মনে হয়। মনে কর, যেখানেই থাক, তোমার যদি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হয়; তার পর কি হবে? ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে কি বলে পরিচয় দেবে? তার দুর্ভাগ্যের কথা কি ভেবেছ? তোমার কোথায় স্থান হবে, তা কি ভেবেছ মা!"

লক্ষ্মী বলিল, "ছেলে হোক মেয়ে হোক, তার পিতৃ-পরিচয় থাক্‌বে না। সে পরিচয় দেবে—সে সতীমায়ের সন্তান—সে আজীবন ব্রহ্মচারিণীর সন্তান। আমি তার কাছে কিছু গোপন করব না। ইহার মধ্যে আমার কলঙ্কের কোন কথা নেই, যে

আস্‌ছে তারও কলঙ্কের কথা কিছু নেই। সমাজে এমন দেখা যায় না, বল্‌বে ; তাই সমাজ এ সব লুকিয়ে ফেলে ; মহাপাতকের কাজ্‌ করে সমাজ সব ঠিক রাখ্‌তে চায়। আমি তা পারলাম না। ছল, প্রতারণা, পাপের কাজ রামকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের মেয়ে করতে পারে না। সতী মায়ের গর্ভে আমার জন্ম কাকীমা ! পাপকে, ছলনাকে, মিথ্যা-প্রবঞ্চনাকে আমি প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা করি। তারই জন্য আমি সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিলাম। ভবিষ্যতে কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ ? সে ভাবনা আমি ভাবি না। আমি কি কোন দিন ভেবেছিলাম, আমার অদৃষ্টে এই হবে ? আমাকে এমন করে তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে ? কাকীমা, এতদিন বাবার কাছে বৃথা উপদেশ পাই নাই,—এতদিন দেবতার মত কাকার কোলে বৃথা মানুষ হই নাই,—এতদিন তোমাদের মত মা-কাকীমার স্নেহে বৃথা বড় হই নাই। তোমাদেরই কাছে শিখেছি, উপরে একজন আছেন ; দণ্ডও তিনি দেন, পুরস্কারও তিনি দেন। কার ব্যবস্থা কে করে কাকীমা ! তোমাদের স্নেহের কোলেই ত ছিলাম ; কিন্তু কৈ, যে দিন বন্যজন্তুর মত কে এসে, আমাকে তার পশু-প্রকৃতির কাছে বলি দিল, তখন ত কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারলে না। তা হয় না কাকীমা ! তা কোন দিনই হয় না। এই কয়দিনে আমি অনেক ভেবে এই বুঝেছি, এই ১৭ বছর বয়সেই বেশ বুঝেছি, সকলই করেন সেই একজন। আমি তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করছি—তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করব। যিনি এই বিপদে

ফেলেছেন, তিনিই উদ্ধার করবেন; আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, আরও বিপদে ফেল্‌বেন। রাখ্‌তে হয় তিনি রাখ্‌বেন, মারতে হয় তিনি মারবেন। তুমি মনে করছ কাকীমা, আমি এত কথা শিখ্‌লাম কোথা থেকে। আমি আজ এই কয়মাসে দশ' বছর বয়স বাড়িয়ে ফেলেছি। আমি দিনরাত ভেবেছি। অনেক ভেবে-চিন্তে যা বুঝেছি, তাই আজ তোমাকে বল্‌লাম কাকীমা! আর হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা না হতে পারে,—আর হয় ত তোমাকে কাকীমা বলে, তোমার কোলে মাথা রেখে সব শোক-তাপ ভুলে যেতে না পারি কাকীমা! কিন্তু জেনে রেখো, যত বিপদ হোক, যত দুর্গতি হোক, তোমাদের স্নেহের বলে আমি কাটিয়ে উঠব। আর যদি প্রাণ যায়, তখনও কাকীমা, তোমাদের কথাই—তোমাদের স্নেহের কথাই মনে করতে করতে জীবন বিসর্জ্জন করব। আমার মৃত্যু-সংবাদ শুন্‌লে কাকীমা, তুমি একটু চোখের জল ফেলো! অদৃষ্টে নেই, সংসার-ধর্ম্ম করতে পেলাম না; কিন্তু আশীর্ব্বাদ কোরো, আমি আজ যে সাহসে বুক বেঁধে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এই সাহস, এই নারীধর্ম্মের তেজ যেন মরণ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে থাকে।”

ছোট-বৌ আর কথা বলিতে পারিলেন না; তিনি লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। লক্ষ্মীর মনে হইল, মা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী যেন স্নেহের অভেদ্য বর্ম্মে তাহাকে আবৃত করিয়া দিল; তাঁহার কয়েক বিন্দু অশ্রু লক্ষ্মীর মস্তকে পড়িল:

—তাহার উত্তপ্ত মস্তক শীতল হইয়া গেল,—তাহার মস্তকে যেন শান্তিবারি বর্ষিত হইল।

এই সময় বারান্দা হইতে অতি কোমল, কাতর স্বরে প্রশ্ন হইল, "মা লক্ষ্মী, জেগে আছিস্ মা!"

"কাকা!"

"হাঁ মা" বলিয়া হরেকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া লক্ষ্মী দাঁড়াইতে গেল; তিনি বলিলেন, "না মা, উঠিস্‌নে। কাল সকালে ত তোকে ভাল করে দেখ্‌তে পাব না; একটা কথাও বল্‌তে পারব না; তাই এখন এলাম। মা লক্ষ্মী, এতদিন বুকে করে তোকে পালন করে শেষে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছি মা!" হরেকৃষ্ণ আর কথা বলিতে পারিলেন না, বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী হরেকৃষ্ণের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া সুধু বলিল, "কাকা!"

হরেকৃষ্ণ কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আর কাকা বলে ডাকিস্‌নে মা! আমি তোর কাকা নই। আমরা তোর কেউ নই মা! সমাজের ভয়ে তোকে বনবাসে দিতে যাচ্ছি মা!"

লক্ষ্মী প্রাণপণ শক্তিতে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া "কাকা" ব্যতীত আর একটী কথাও বাহির হইল না। যে লক্ষ্মী এতক্ষণ তাহার কাকীমার সহিত এত

কথা বলিল, এত তেজের কথা—এত স্পর্দ্ধার কথা বলিল, কাকার সম্মুখে সে সব কোথায় গেল—সে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে সুধু বলিল "কাকা—কাকা গো !"

সর্ব্বদর্শী বিধাতা এ দৃশ্য দেখিলেন ;—গভীর রজনীর অন্ধকার এ দৃশ্য দেখিলেন ;—দেবীরূপিনী ছোটবধূ এ দৃশ্য দেখিলেন ; আর পাপতাপক্লিষ্ট দীন লেখক এ দৃশ্য দেখিয়া ধন্য, কৃতার্থ হইয়া গেল ।

১০

পরদিন বেলা নয়টার সময় যাত্রা করিতে হইল। প্রাতঃকাল হইতেই প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটেই খাল। সেই খালে নৌকায় উঠিতে হইবে। নৌকায় কিছুদুর যাইয়া তবে ষ্টীমার পাওয়া যাইবে। হরেকৃষ্ণ ও গ্রামের দুই একজন ষ্টীমার-ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জিনিষপত্র নৌকায় তোলা হইল।

এখন বিদায়ের পালা। বড় কর্ত্তা গম্ভীর মুখে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। যাহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্র, তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; যাঁহারা প্রণম্য, বড় কর্ত্তা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগ্রসর হইলে বড় কর্ত্তা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মধু কাকা, আপনার উপর নির্ভর করেই আমি চললাম। হরি ছেলেমানুষ, কখন এমন ভাবে থাকে নাই; আপনি সর্ব্বদা তাকে দেখ্‌বেন; সকল সময়ই উপদেশ দেবেন। বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়বেন। আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব।"

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এখানকার জন্য তুমি কোন চিন্তা কোরো না রাম! আমি আছি, গ্রামের সকলেই আছেন। হরির কোন অসুবিধা হবে না। রাস্তা থেকে যদি পত্র লিখ্‌বার সুবিধা না পাও, কাশী পৌঁছেই একটা সংবাদ দিও। পত্র আস্‌তে ত চার পাঁচদিন লাগবে। তার চাইতে তুমি একটা তার করে দিও। যতদিন তোমার মঙ্গল-মত পৌঁছা খবর না পাওয়া যাবে, ততদিন আমরা সকলেই বড় চিন্তিত থাক্‌ব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তাই করব।"

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। এদিকে মেয়েদের আর বাহির হওয়া হয় না। মধু ভট্টাচার্য্য একজনকে বলিলেন, "ওহে দেখ ত, ওরা দেরী করছে কেন, সময় যে যাচ্ছে; ওদিকে ষ্টীমার ধরা ত চাই। ষ্টীমার ফেল হ'লে একটা দিন ঘাটে বসে থাক্‌তে হবে।"

একজন বলিল, "মেয়েদের কি শীঘ্র বা'র করা যায়। কান্নাকাটি লেগে গেছে।"

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কান্নাকাটি কেন? যাও, একটু তাড়াতাড়ি কর। ছোট-বৌমা বুঝি কাঁদছেন?"

শীতল মাঝি বলিল, "ছোট ঠাকরুণ কেন, সবাই কাঁদছে। বাড়ী যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। বড় ঠাকরুণ যে গরীবের মা ছিলেন। তাঁকে কি কেউ সহজে ছেড়ে দিতে চায়।"

ঘাটের উপরে দাঁড়াইয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; লোকের পর লোক যাইতে লাগিল। অবশেষে পাড়ার মেয়েদের

সঙ্গে বড় গিন্নী ও লক্ষ্মী ঘাটে আসিলেন। বড় গিন্নী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই আসিলেন। লক্ষ্মী কিন্তু ধীর, স্থির; তাহার চক্ষে জল নাই, তাহার দৃষ্টি অবনত; ধীরে ধীরে সে মায়ের পশ্চাতে-পশ্চাতে আসিল। তাহার পর সকলকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিল। বড় গিন্নী সকলকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ, প্রণাম করিয়া নৌকার মধ্যে যাইয়া বসিলেন। বড় কর্ত্তা, হরেকৃষ্ণ এবং আরও দুই একজন নৌকায় উঠিলেন।

ভোলা পাগ্‌লা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। শীতল মাঝি যখন নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল, ভোলা তখন গায়িয়া উঠিল—

“এমন সোণার কমল ভাসায়ে জলে—এ—এ—
আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ—এ”

ভোলার এই গান শুনিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। শীতল নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভোলা তখনও গায়িতে লাগিল—

“ওরে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ।”

যতক্ষণ নৌকা দেখা গেল, ততক্ষণ কেহই ঘাট হইতে নড়িল না। নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেল। মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “আজ আমাদের এ পাড়াটা সত্যসত্যই আঁধার হোলো।”

একজন বলিল, “সকলকেই যেতে হবে, তবে দুদিন আগে আর পাছে।”

ভোলা পাগলা বলিল, "ঠিক বলেছ দাদা—লাখ কথার এক কথা।" এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে
চিরদিন ত কেউ রবে না।
ওরে, সেই স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পার,
ওপার আছে তা জান না;
কেমনে ও-পার যাবে, পার হইবে,
সে ভাবনা কেউ ভাব না।"

১১

বড় কর্ত্তা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, নৈহাটী হইয়া কাশী যাইবেন, কলিকাতায় আর যাইবেন না; কিন্তু পথের মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল। জন্মের মত দেশ ছাড়িয়া যাইতেছেন,—একবার কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করিয়া যাইবেন না? তাই কালীঘাটে একদিন থাকিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। গ্রামের দুই চারিজন লোক কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন। পূর্ব্বে সংবাদ দিলে, তাঁহারা ষ্টেসনেও উপস্থিত থাকিতে পারিতেন এবং কলিকাতায় একরাত্রি বাসেরও ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তাহা করা হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা শিয়ালদহে নামিয়া বরাবর কালীঘাটে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাত্রীদিগের বাসের জন্য যে সকল আশ্রম আছে, তাহারই একটীতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান ও মা-কালী দর্শন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেদিন কালীঘাটেই বাস করেন; কিন্তু বড় গিন্নী তাহাতে আপত্তি করিলেন; তিনি বলিলেন, "পথের মধ্যে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই; আজই রওনা হওয়া যাক্।"

এতটা পথ নৌকায়, ষ্টীমারে ও রেলে আসিয়া লক্ষ্মী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য বড় কর্ত্তা বলিলেন,

"লক্ষ্মীর একটু বিশ্রামের দরকার; সেই জন্য আরও থাকবার ইচ্ছা।"

লক্ষ্মী বলিল "না বাবা, আমার কোনই কষ্ট হয় নাই, আমি বেশ যেতে পারব; আমার জন্য দেরী করবার কিছুই আবশ্যক নাই।"

গিন্নীরও মত হইল, মেয়েরও মত হইল, কাজেই সেইদিনই সন্ধ্যার সময় তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

হাওড়া ষ্টেসনে পৌছিয়া বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে পথে গয়াটা হইয়া যাই।"

বড় গিন্নী তাহাতেও আপত্তি করিলেন, বলিলেন, "গয়া-কার্য্য ত শেষই করা হয়েছে; তবে আর গয়ায় গিয়ে কি হবে? পথে আর বিলম্বে কাজ নাই। এখন কোন রকমে কাশী পৌছিতে পারলেই হয়।"

বড় গিন্নীর এত তাড়াতাড়ির উদ্দেশ্য কর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন; মেয়ের যে প্রকার শরীরের অবস্থা, তাহাতে পথের মধ্যে যদি কিছু হয়, বিশেষতঃ এই দীর্ঘপথ রেলে যাওয়ায় তাহার সম্ভাবনাও আছে, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়াই গিন্নী এত তাড়াতাড়ি করিতেছিলেন। কর্ত্তা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে কাশী যাওয়াই স্থির করিলেন।

সন্ধ্যার পর মেল গাড়ীতে তাঁহারা কাশী যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মীর শরীর অসুস্থ, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের বড়ই ভিড় হয়; এই জন্য তিনি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট করিয়াছিলেন।

তাঁহারা যে গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাতে দুই তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন,—সকলেই বাঙ্গালী। তিন জনের মধ্যে দুইজন বর্দ্ধমানে যাইবেন, তৃতীয় জন—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর—তিনি কাশীতে যাইবেন।

বড় কর্ত্তা সপরিবারে কাশীবাস করিতে যাইতেছেন, শুনিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে এক-সঙ্গেই যাওয়া যাবে? কাশীতে কি বাড়ী ঠিক করেছেন?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "না, বাড়ী ঠিক করি নাই। সেখানে গিয়ে যা হয়, করা যাবে।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "অবশ্য, বাড়ী যে পাবেন না, তা নয়; তবে আগে থাক্‌তে ঠিক করে গেলে আর কোন অসুবিধা হোতো না।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি কি কাশীতেই থাকেন?"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "এক রকম থাকি বল্‌লেই হয়; অনেক সময়ই কার্য্যোপলক্ষে থাকৃতে হয়, আবার মধ্যে-মধ্যে দেশেও আস্‌তে হয়।"

"মহাশয়ের নামটী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"বিলক্ষণ! তা পারবেন না কেন? আমরা ত আর একেলে বাবু নই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলে অপমান বোধ করব। আমার নাম শ্রীসত্যচরণ দাস; আমরা কায়স্থ—দক্ষিণ রাঢ়ী; কল্‌কাতাতেই আমাদের চার পাঁচ পুরুষের বাস। মশাইয়ের নাম?"

"আমার নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফরিদপুর জেলায় কাঞ্চনপুরে আমার নিবাস। কাশীতে বাস করব বলেই সপরিবারে যাচ্ছি। ছেলে-পিলে আর নেই, ঐ মেয়েটীই সম্বল। মেয়েটীরও অদৃষ্ট মন্দ! তাই মনে করলাম, আর কেন, কাশীতেই শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দিই। বাড়ীতে ছোট ভাই আছেন; যা সামান্য বিষয়-আশয় আছে, তিনিই দেখ্‌বেন শুন্‌বেন।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "কাশীতে গণেশ মহল্লায় আমার একটী ছোট বাড়ী আছে। সেটী ভাড়া দিই। বাড়ীটী কিন্তু বড়ই ছোট; দোতলা নয়, একতলা; দুটী শোবার ঘর আছে; একটা বারান্দা আছে, রান্নাঘর পাইখানা পৃথক আছে। তা, আপনারও ত খুব বড় বাড়ীর দরকার হবে না। আপনার যদি পছন্দ হয়, তা হলে সেইটে আপনি ভাড়া নিতে পারেন। পল্লীটাও ভাল; ছোটলোকের বাস নেই। তবে একতলা, এই যা কথা। সেঁতসেঁতে নয়, ঘর দুইখানাই খুব উঁচু। আপনার অপছন্দ হবে না। আগে যারা ভাড়াটে ছিল, তারা চলে গেলে আমি বাড়ীটা চূণ ফিরিয়েছি। মনে করেছি, দুচার দিনের ভাড়াটে আর রাখব না। যারা বেশী দিন থাক্‌বে, তাদের কাছেই ভাড়া দেব। আপনি যখন কাশীবাস করতেই যাচ্ছেন, তখন আপনাকে দিতে পারি।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি বাড়ীর কথা যা বল্লেন, ঐ রকম ছোট বাড়ী হলেই আমার বেশ চল্‌বে, তিনজন মানুষ বৈ ত নয়। ঘর দুইটা একটু খট্‌খটে হলেই হোলো। মেয়েটী অসুস্থ; সেই জন্যই একটু রোদ-হাওয়া খেলে, এই রকম বাড়ীর দরকার।

বিশ্বনাথের কৃপায় আপনার সঙ্গে পথেই আলাপ হোলো, আর আপনি এমন অযাচিত ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হোলেন, এতে মনে যথেষ্ট ভরসা হোলো।”

সত্যবাবু বলিলেন, “আর আমার বাসের বাড়ীও ঐ বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শুনা হবে; আর আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হতে পারে, তা আমি অবশ্যই করব। আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। আমরাও আপনাদেরই দাস; আপনাদের সেবা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।”

“কাশীতে কি আপনি বিষয়কর্ম্ম করেন, না অমনিই বাস করেন?”

“বিষয়-কর্ম্ম তেমন নয়। দুটী ছেলেই মানুষ হোলো। নিজে দেশেই কন্‌ট্রাক্‌টরী কাজ করতাম। বড় ছেলেটীই এখন সে সব দেখে; ছোট ছেলেটী এটর্ণী হয়েছে; দু পয়সা আন্‌ছে। মেয়ে তিনটীরও বিবাহ দিয়েছি। দুইটীই সুখে সচ্ছন্দে আছে; বড় মেয়েটী,—সেইটীই আমার প্রথম সন্তান—বিধবা হোলো; ছেলেপিলেও নেই যে, তাই নিয়েই স্বামীর ভিটেয় পড়ে থাক্‌বে। তাকে নিয়ে এলাম। তখন মনে হোলো, এক রকম সবই ত গুছিয়ে দিয়েছি; এখন আর কেন, কাশী গিয়ে বাস করি। তাই এই বছর তিনেক হোলো পরিবার ও মেয়েটীকে নিয়ে এখানে এসেছি; ছেলে-মেয়েরা মধ্যে-মধ্যে আসে; আমিও যখন-তখন কলিকাতায় যাই। কাশীতে গিয়ে চুপ করে থাকা ভাল লাগল না। এতকাল খেটে এসেছি—চুপ করে নিষ্কর্ম্মা হয়ে কি থাকা যায়? তাই কাশীতেও

ঐ টুক্‌টাক রকম কনট্রাক্‌টরী করি ;—কোন রকমে খান তিনেক বাড়ীও করেছি। একখানিতে থাকি, সেখানি তেমন বড় নয়—তাতেই কুলিয়ে যায়। বড়খানি ভাড়া দিয়েছি, মাসে ৮০৲ টাকা পাওয়া যায় ; আর আপনাকে যেখানির কথা বল্‌লাম, সেখানিতেও দশ-বার টাকা আসে। ঐতে কোন রকমে চলে যায়।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তা হলে যে-বাড়ীখানি আমাকে ভাড়া দিতে চাচ্ছেন, তার ভাড়া মাসে বার টাকা। এত বেশী ভাড়া দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত হবে না। আপনাকে খুলেই বলি। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ ; সামান্য কিছু জোতজমা আছে ; আর শিষ্য-যজমানই ভরসা। বাড়ীতে ছোট ভাই আছে, ভাদ্র-বধূ আছেন, গৃহদেবতা নারায়ণ আছেন ; তারপর লোক লৌকিকতা আছে। এই সকলের মধ্য থেকে কোন রকমে মাসিক ত্রিশটী টাকার ব্যবস্থা করে, আমরা কাশী যাচ্ছি। সেই ত্রিশ টাকার মধ্যে বার টাকা যদি বাড়ী-ভাড়াই দিই, তা হলে চল্‌বে কি করে? হাটবাজার ও ঘরের কাজ করবার জন্য একটা ঝিয়েরও দরকার হবে ; তার পর, পূজা-অর্চ্চনা, পাল-পার্ব্বণ ত আছে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যক্তি কাশীতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারবেন। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। যেমন করে হোক, মাসে যাতে গড়ে পনর কুড়ি টাকা আপনার হয়, তা অনায়াসে ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কাশীতে গিয়ে আর দান গ্রহণের ইচ্ছা

নেই। বাড়ী থেকে যা আস্‌বে, তাই দিয়েই কোন রকমে চালাতে হবে ; অর্থ-উপার্জ্জনের স্পৃহা আর নেই।”

সত্যবাবু এই কথা শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, “আপনার সঙ্গে যখন কথা পেড়েছি, তখন আপনাকে আর অন্য স্থানে যেতে দিচ্ছিনে। আপনি দীর্ঘকাল থাক্‌বেন। বেশ, আপনি মাসে নয়টী টাকা দেবেন, ট্যাক্‌স-খাজনা সব আমার জিম্মা। আর ঝির কথা বল্‌ছেন ; আমি একটা বেশ বিশ্বাসী ঠিকে ঝি দেব। মাসে তাকে দুটী টাকা দিলেই হবে। সে হাটবাজার করে দেবে, বাড়ীর কাজ করে দিয়ে ঘরে চলে যাবে। তা হলেই আপনাদের বেশ চলে যাবে। বিপদ-আপদ আছে, আমিও ত পাড়াতেই থাক্‌ব ; আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমার খবর দেওয়া আছে ; সরকার ও চাকর ষ্টেশনে আস্‌বে। চাকরটাকে আপনাদের সঙ্গে দেব এখন। সে আপনাদের নিয়ে একেবারে বাড়ীতে তুলে দেবে ; আর তাকেই বলে দেব, আপনাদের জিনিষপত্রগুলো কিনে দেবে। তার পর যখন যা দরকার হবে, আমাকে বল্‌বেন ; আমি গুছিয়ে দেব। আমার সে বাড়ীতে তিন চারখানা তক্তপোষ আছে ; আপনাদের আর সে সব করে নিতে হবে না। একতলা বাড়ী কি না, তাই তক্তপোষ রেখে দিয়েছি।”

বড় কর্ত্তা বলিলেন, “আমার সৌভাগ্য যে পথেই আপনাকে পেলাম। আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ ; আমাদের এ সব গুছিয়ে নিতে অনেক বেগ পেতে হোত।”

এই রকম কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল। গাড়ী তীরবেগে ছুটিতেছে। আসানসোল পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে চারিজন মানুষ মাত্র; সুতরাং বিশ্রামের কোন ব্যাঘাতই হইল না।

পরদিন মোগলসরাইতে গাড়ী বদল করিতে হইল। সত্যবাবুই কুলী ডাকিয়া দ্রব্যাদি কাশীর গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী কাশী ষ্টেসনে পৌছিল। সত্যবাবুর সরকার ও চাকর ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। তিনি সকলকে নামাইয়া, একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাকরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন এবং তাঁহাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবার আদেশ দিয়া নিজে স্বতন্ত্র গাড়ীতে বাসায় গেলেন।

১২

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বাবু অতি সদাশয় ব্যক্তি। বড় কর্ত্তার সহিত গাড়ীতে পরিচয় হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ অতি পণ্ডিত, সৎলোক। তাঁহাকে সপরিবারে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া সত্যবাবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বড় কর্ত্তার সহিত কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি চোদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন এবং দুই তিনদিন বাঙ্গালী-টোলায় একটা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; কাশী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। সেই জন্য সত্যবাবু তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহাদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় কর্ত্তা ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; রন্ধনাদির কোন উদ্যোগ আয়োজনই করা হয় নাই।

সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁড়ুয্যে মশাই, পাকের কোন উদ্যোগই ত দেখছি না।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এই সবে গঙ্গাস্নান করে পূজা-আহ্নিক শেষ করে এলাম। বেলাও প্রায় তিনটা বাজে; এখন

আর পাকের যোগাড় করা সঙ্গত মনে করিলাম না। সন্ধ্যার পরই যা হয় করা যাবে। আপনার চাকর রমেশ লোকটী বেশ, বড়ই অনুগত। সে ঘরদ্বার পরিষ্কার করে দিয়ে জিনিষপত্র কিনবার টাকা নিয়ে গেছে। তারও ত আহার হয় নাই। তাকে বলে দিয়েছি, তাড়াতাড়ির দরকার নেই; সে যেন আহারাদি ক'রে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমার জিনিষগুলি কিনে দিয়ে যায়। আপনার এ বাড়ীটী অতি সুন্দর দাস মহাশয়! আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে; বেশ দক্ষিণ-খোলা বাড়ী; ঘরগুলোও ভাল। আঁধার নেই। আপনার অনুগ্রহ ও সাহায্যের কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে। আপনার সঙ্গে গাড়ীতে দেখা না হলে আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হোত; হয় ত এতক্ষণও বাড়ী মিল্‌ত না; আর মিল্‌লেও এমন মনের মত হোত না। তার পর এই বিদেশ যায়গায় আপনার মত সহায় লাভ করাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আপনি অমন কথা বল্‌ছেন কেন? আমি আর আপনার কি সাহায্য করলাম। বাড়ী খালি ছিল, ভাড়া দিলাম; এই ত। এর জন্য আপনি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কেন?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "দাস মশায়, আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনি বুঝতে পারতেন। কাশী বাবা বিশ্বেশ্বরের ধাম, নিন্দা করতে নেই। কিন্তু কাশী সম্বন্ধে আমার তিনদিনের অভিজ্ঞতা, যা সেই পনর বছর আগে জন্মেছিল, তা কিন্তু আমি এত

দিনেও ভুলতে পারি নাই। তাই মনে বড় আশঙ্কাই জন্মেছিল। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।”

সত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আপনি ত নিশ্চিন্ত হয়েছেন বাঁড়ুয্যে মশাই, কিন্তু আমি ত নিশ্চিন্ত হোতে পারলাম না। আমার বাড়ীতে আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান এসে এতক্ষণ উপবাসী রয়েছেন, মাঠাকরুণ আর মেয়েটীও হয় ত মুখে একটু জল দেন নাই, এতে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না।”

বড় কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “জানেন কি সত্যবাবু, আমরা যজমান-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, আমাদের মাসের মধ্যে যেমন করে হোক দশ দিন উপবাস করতেই হয়; তাতে আমাদের কষ্ট হয় না; আমরাও ও-বিষয়ে যেমন পরিপক্ক, আমাদের গৃহিণীরাও কম নন; আমরা যদি মাসে দশদিন উপবাস করি, তাঁরা করেন পনর দিন। সুতরাং সে জন্য আপনার চিন্তার প্রয়োজন দেখ্ছি না। গৃহিণী গঙ্গাজল নিয়ে এসেছেন, আর এক পয়সার বাতাসাও কিনে এনেছি; ফলটল বড় দেখ্তে পেলাম না,—অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে কি না,—সেই বাতাসা মুখে দিয়ে গঙ্গাজল পান করে আমরা বেশ তৃপ্তি লাভ করেছি। রমেশ বিকেল-বেলাই সব নিয়ে আস্বে; সন্ধ্যার পরই যা হয় করা যাবে। একটা গৃহস্থালী নূতন করে পাততে সময় লাগে সত্যবাবু!”

সত্যবাবু বলিলেন, “আপনারা দুইজনে ত বেশ ব্যবস্থা করলেন এবং তৃপ্ত ও হলেন; কিন্তু মেয়েটী যে কষ্ট পাচ্ছে।

সে ত এখনও আপনাদের মত উপবাসে অভ্যস্ত হয় নাই; বিশেষ তাকে যে রকম অসুস্থ দেখ্‌লাম, তাতে তার, এসেই গঙ্গাস্নান করাটাই ভাল হয় নাই; তার পর এই উপবাস। একটা অসুখ হতে ত পারে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমরা মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে শিখিয়ে থাকি সত্যবাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না; লক্ষ্মীর কোন কষ্ট হবে না।"

"না, না, সে হতেই পারে না বাঁড়ুয্যে মশাই। বাজারের মিষ্টান্ন না হয় মেয়েটী নাই খেলো; আমি ফলমূল ও রাবড়ী এনে দিচ্ছি—এখানকার রাবড়ী অতি উৎকৃষ্ট, জানেন ত?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কিছু দরকার নেই সত্যবাবু! আপনি যে রকম আরম্ভ করলেন, তাতে দেখ্‌ছি আমাদের এ বাড়ী থেকে পালাতে হবে।"

"সে দেখা যাবে" বলিয়া সত্যবাবু চলিয়া গেলেন। বড় কর্ত্তা সহাস্য বদনে ভিতরে যাইয়া বড় গিন্নীকে বলিলেন "গিন্নী, কাশীবাসের সূচনাটা ত ভাল বলেই বোধ হচ্ছে।"

বড়-গিন্নী স্বামীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই শান্তি অনুভব করিলেন। আজ কতদিন তাঁহার মুখে এমন হাসি তিনি দেখেন নাই; তাই হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ করুন, এমনই করে সব দিকে মঙ্গল হয়; তা হলে বাবাকে পূজা দেব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তাই হবে গিন্নী, তাই হবে। বাবার

ধামে এসে কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাকলে কোন বিপদ থাকে না। আমার মোহে অন্ধ, তাই বিপদ দেখে ভয়ে কাতর হই গিন্নী! বিপদভঞ্জন বিশ্বনাথের নাম ভুলে যাই; আর সেই জন্য কত অকার্য্য কুকার্য্য করি। মা লক্ষ্মী, স্নান করে ত তোমার শরীর খারাপ বোধ হচ্চে না? ঐ ভয়ে কাল কালীঘাটে তোমাকে গঙ্গাস্নান করতে দিই নাই।"

লক্ষ্মী বলিল, "না বাবা, আমি বেশ আছি। ঐ বাবুটী আমার জন্য কষ্ট করে খাবার আন্‌তে গেলেন, তুমি যেতে দিলে কেন বাবা!"

"উনি যে তোমার বাবার কথা শুন্‌লেন না। ওঁরও মেয়ে আছে মা! সন্তানের উপর মা-বাপের যে কি মমতা, তা যে উনি জানেন। আমিই তোমার পাষণ্ড পিতা!" বলিয়াই বড় কর্ত্তা মুখ মলিন করিলেন। পিতার প্রসন্ন বদন দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে যে শান্তি আসিয়াছিল, তখনই তাহা দূর হইয়া গেল; তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

বড় কর্ত্তা লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার বড়ই অনুশোচনা হইল। তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মী, মা আমার, তোমার এই বুড়া বাপের কথায় মনে কষ্ট কোরো না মা! আমার কি আর এখন বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। যাক্, সত্যবাবু এলে তাঁকে বলে রাখতে হবে, তিনি যেন বিশ্বনাথের আরতি দেখাবার জন্য আমাদের সঙ্গে একজন লোক দেন। ঐ রমেশকে দিলেই হবে। দুই একদিন পথ দেখিয়ে দিলেই

শেষে আমরা যেতে পারব। এই ত, আজ গঙ্গাস্নান থেকে ফিরবার সময় রমেশ ত আর পথ দেখায় নাই; সে সঙ্গে মাত্র ছিল; আমরাই ত ঠিক পথ চিনে এসেছি; কি বল মা!"

লক্ষ্মী বলিল, "সহরের পথে-ঘাটে চলা ত আমাদের অভ্যাস নেই, তাই কেমন বাধ-বাধ ঠেকে; লোকজন দেখ্‌লে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, না বাবা!"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এখানে দুইচার দিন চল্‌লে-ফিরলেই সঙ্কোচ দূর হবে। দেখ, আরতি দর্শন করে এসে তার পর পাকের যোগাড় করা যাবে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সব গুছিয়ে রেখে যাব। এসেই রান্না চড়িয়ে দেব। আজ আর কোন হাঙ্গামা করা হবে না; দুটো ভাতে-ভাত করলেই হবে।"

রমেশ বাহিরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তাহার সঙ্গে একটা কুলীর মাথায় কতক জিনিসপত্র, আর কতক সে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে।

বড় গিন্নী বলিলেন, "বাবা, তুমি কষ্ট করে এত জিনিস বয়ে আন্‌লে কেন? আর একটা লোক নিলেই ত হোতো। আহা, তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।"

রমেশ বড় গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, আমাদের কি আর এতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় কিসে জানেন; যখন প্রাণ দিয়ে খেটেও মনিবের মন পাইনে, গালাগালি শুনি, তখনই কষ্ট হয়। আমাদের মুখ চেয়ে 'আহা' বল্‌বার লোক নেই বলেই

জান্‌তাম। আজ দেখলাম আছে গো, আছে। ওরে, জিনিসগুলো নামা।" এই বলিয়া দ্রব্যাদি নামাইয়া বারান্দায় রাখিতে লাগিল।

সমস্ত জিনিস নামাইয়া, কুলী বিদায় করিয়া রমেশ বলিল, "ঠাকুর মশাই, হিসাবটা ঠিক করে নিন্। মাঠাকরুণ, দেখুন, কিছু আন্‌তে ভুল ত হয় নাই। আমি এই হিসাব বুঝিয়ে দিয়েই একবার যাই। বাড়ীতে কত কাজ পড়ে আছে। তারপর আবার একবার আস্‌ব এখন মাঠাকরুণ। তখন, যদি কিছু আরও আন্‌বার দরকার থাকে, এনে দিয়ে যাব। ঠাকুর মশাই, এই ধরুন, তিনসের আতব চা'ল; এই দশ পয়সা করে সের হ'লে, হোলো গিয়ে——"

তাহার হিসাবে বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল,"তোমাকে হিসেব দিতে হবে না। যা পয়সা বেচেছে, তাই মার হাতে দিয়ে যাও, আর যদি বেশী খরচ হয়ে থাকে, তাই বল; অত 'হোলো গিয়ে—'র দরকার হবে না।"

রমেশ বলিল, "মাঠাকরুণ, তাই বুঝি দিদি ঠাকরুণের নাম লক্ষ্মী রেখেছেন মা! দশ বছর বয়স থেকে এই কাশীতে চাকরী করছি, আর আজ এই পঞ্চাশ বছর বয়স হোলো, এমন লক্ষ্মী ত কোন দিন দেখিনি মাঠাকরুণ! আরও না হয় ত, দশ বারটা বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী চাকরী করেছি।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন "রমেশ, আমরা যে বাবু নই; আমরা গরিব ব্রাহ্মণ!"

“ঠিক তাই, তা নইলে কি এমন লক্ষ্মী ঘরে আসে। তা হোক্, ঠাকুর মশাই, পাঁচ টাকা ত দিয়েছিলেন, তার এই—সবুর করুন, গণে দেখি। এই হোলো দুইটা সিকি, আর—”

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,“আবার হিসেব,—আবার ‘এই হোলো’।”

“তা হলে কি করব দিদিঠাকরুণ, তুমিই বলে দেও।”

“যা আছে, মার কাছে ফেলে দেও, উনি গণে নিতে হয় নেবেন, না হয় তুলে রাখ্‌বেন।”

“দিদিঠাকরুণ, এমনই করে বুঝি সংসার করবে! গণতে হবে লক্ষ্মী দিদি, গণতে হবে। গণে-গণে পা ফেল্‌তে হয় দিদি—পা পর্য্যন্ত ফেলতে হয়। তা সে কথা এখন থাক্। দেখুন ঠাকুর মশাই, কাশী যায়গা; অমন করে বাইরের দুয়োর খুলে রাখ্‌বেন না; রাত-বিরেতে যাকে-তাকে দুয়োর খুলে দেবেন না। আমি যখন এসে ডাক্‌ব ‘ঠাকুর মশাই, আমি রমেশ’ তখনই দুয়োর খুল্‌বেন। জন্ম থেকে এই কাশীতে কাটালাম কি না, এর হাট-হদ্দ এই রমেশ জানার জান্‌তে বাকী নেই। এখন আমি তা হলে মা-ঠাকরুণ!—একটা প্রণাম করে যাই।”

লক্ষ্মী বলিল, “আস্‌তে-যেতে যদি এত প্রণাম কর, তা হলে তোমার মাথা ব্যথা হয়ে যাবে যে!”

রমেশ বলিল, “প্রণামের কথা যদি তুল্‌লে দিদি লক্ষ্মী, তবে শোন। এই যে দেখ্‌ছ রমেশ জানা—কৈবর্ত্তের ছেলে—এ কোন দিন—আজ পর্য্যন্ত কোন দিন কাউকে প্রণাম করে নাই,—তোমার ওই বাবা বিশ্বনাথকেও না—সেই মা অন্নপূর্ণাকেও না,—

মানুষ ত কোথায় থাকে ;—যাদের চাকরী করেছি, আর এখনও করছি, তারা ষোল আনা মাহিনে দেয়, আঠারো আনা খেটে দিই, —ব্যস্। প্রণাম করব কেন ? কার কাছে কি উপকার পেয়েছি—কার কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়েছি যে, তাকে প্রণাম করব। এই যে তোমরা যখন গাড়ী থেকে নামলে, তোমরা ত বামুন, তোমাদের ত প্রণাম করতে হয় শাস্তরে লেখে। আমি কি প্রণাম করেছিলাম ? সে ছেলে পাও নি এই রমেশ জানাকে মাঠাকরুণ ! আজ এই আপনাকে মাঠাকরুণ, প্রথম প্রণাম করছি ; আর বয়সে ছোট হলে কি হয়—আর এই তোমাকে প্রণাম করছি দিদি লক্ষ্মী ! রমেশ জানার মাথাটা তোমরাই নোয়ালে এই এতকাল পরে।” এই বলিয়া রমেশ দুইজনকে প্রণাম করিল।

বড় কর্ত্তা বলিলেন,“আমাকে একটা প্রণাম করলে না রমেশ !”

রমেশ অম্লানবদনে বলিল “না, ঠাকুর মশাই। রমেশ জানা মানুষ চেনে। এখন যাই। আবার আসব এখন। রাত্তিরে এসে মাঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ, গান শুনিয়ে যাব।” এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল।

বড় কর্ত্তা বলিলেন “মা লক্ষ্মী, এই যে রমেশকে দেখছ, এ দেবতা—মানুষ নয়।”

রমেশ চলিয়া যাওয়ার পরই সত্যবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; সঙ্গে একটা লোক ; তাহার মাথায় একটা চেঙ্গারি। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিলেন “বাঁড়ুয্যেমশাই, একবার বাইরে আস্‌বেন।”

বড় কর্ত্তা বাহিরে আসিয়াই দেখেন, সত্যবাবু উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন ; সঙ্গের লোকটী চেঙ্গারিখানি বারান্দায় নামাইয়াছে।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এ সব কি, সত্যবাবু?"

সত্যবাবু বলিলেন "কৈ, কিছুই না।" এই বলিয়া লোকটীকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এমন অত্যাচার করলে আমাকে যে এ বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে।"

"যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন আর পালাবার পথ নেই। মেয়েকে ডাকুন, এগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে এখনই কিঞ্চিৎ জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিক্।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এ ত জলখাবার নয়, এ যে ভোজের ব্যাপার।"

"ব্রাহ্মণের মুখে এমন কথা শোভা পায় না ; তেমন খাইয়ে হ'লে এ সামান্য জিনিস ত তার কাছে নস্য বল্‌লেই হয়।"

বড় কর্ত্তা তখন লক্ষ্মীকে ডাকিলেন ; বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, ছোট সতরঞ্চিখানা বাহিরে দেও। সত্যবাবুকে বসবার আর কি আসন দেব। আর এইগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, সত্যবাবুর জন্য একটু জলখাবারের আয়োজন করে দেও মা!"

সত্যবাবু বলিলেন, "মাপ করবেন বাঁড়ুয্যে মশাই, আমি এই অবেলায় খেয়েছি। বেশ ত, আর একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে যাব ; আজ নয়।"

লক্ষ্মী জিনিসগুলি ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মা

বল্‌ছেন, আপনি একটু জল না খেলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন।"

"তা হলে আর উপায় নেই মা! আচ্ছা আমি বস্‌ছি। তোমার বাবাকে আগে দেও; তার পরে আমি প্রসাদ পাব।"

তখন দুইজনে বসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিলেন। একটু পরেই লক্ষ্মী বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা, জলখাবার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বসবার যে আসন নেই; সবে একখানি কুশাসন তোমার আহ্নিকের জন্য বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আমার আসনের দরকার নেই। আমি বাসা থেকে খান-দুই আসন পাঠিয়ে দেব। আর কি কি দরকার আমাকে বলে দেও ত মা!"

লক্ষ্মী বলিল, "আর কিছুরই ত এখন দরকার দেখ্‌ছিনে।"

তখন দুইজনেই সামান্য কিছু জলযোগ করিলেন। তাহার পর বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সত্যবাবু, আমরা ত পথ-ঘাট চিনিনে। রমেশকে যদি সন্ধ্যাবেলা একটু ছেড়ে দেন, তা হ'লে আমাদের বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়ে আনে। দুই-একদিন সঙ্গে নিয়ে গেলেই আমরা পথ-ঘাট চিনে নিতে পারব।"

সত্যবাবু বলিলেন "আমি বাসায় গিয়েই রমেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাকে আরও বলে দেব যে, বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে যেন এখানে এসে রাত্রিতে শুয়ে থাকে। নূতন স্থানে এসেছেন; কখন কি দরকার হয়, তা ত বলা যায় না। একটা ঠিকে ঝি কালই পাঠিয়ে দেব।" এই বলিয়া সত্যবাবু চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রমেশ সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথের আরতি দেখাইয়া আনিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সে রাত্রিতে এখানেই থাকিবে, বাবু হুকুম দিয়াছেন।

বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তোমার শোবার বিছানার কি হবে ? আমাদের সঙ্গে ত বেশী বিছানা নেই ; আমরা ছোট একখানি সতরঞ্চি দিতে পারব।"

রমেশ বলিল, "সে জন্য ভাববেন না মাঠাকরুণ, সে সব আমি ঠিক করে নেব।"

"না বাছা, তুমি বাসা থেকে তোমার বিছানা নিয়ে এস, নইলে যে কষ্ট হবে।"

"তা হলে রমেশের কষ্টের কথা ভাববার লোক এতদিনে একজন জুটে গেল দেখ্‌ছি। আজ এই চল্লিশ বছর তুমি কোথায় ছিলে মা ! আমার মা মরবার পর এ চল্লিশ বছর ত কেউ আমার কষ্টের কথা ভাবে নাই।"

এই বলিয়া গুন-গুন করিয়া কি যেন গায়িতে-গায়িতে রমেশ চলিয়া গেল।

১৩

নূতন করিয়া সমস্ত গোছাইয়া রান্না আহার শেষ করিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। রমেশ দশটার সময় আসিয়া দেখে, তখনও বড় কর্ত্তা আহারে বসেন নাই। রমেশ রান্না-ঘরের নিকট যাইয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, এখনও রান্না হোলো না, রাত যে দশটা বেজে গেল। তোমাদের কি, তোমরা ত চিরদিন উপোস করেও কাটাতে পার; দিদি লক্ষ্মী যে ক্ষিদেয় মারা পড়বার যো হোল।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমার আজ আর না খেলেও চলে।"

"তবে আর কি, মাঠাকরুণ, উনন নিবিয়ে দিন। দশটা বাজল দেখে,'আমার মনে হোলো মা, তোমরা বুঝি আমার জন্য বসে আছ। তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সেরে, অমনি নাকে-মুখে চারটে দিয়ে দৌড়ে এলাম। এখন দেখি কি না, তোমাদের রান্নাই নামে নাই।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "মনে করেছিলাম, আজ আর কিছু করব না, আলু ভাতে দিয়ে চারটী ভাত নামিয়ে নেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম. কর্ত্তার সুমুখে কেমন করে আলু-ভাতে ভাত ধরে দেব। তা ত কোন দিন পারি নেই বাছা! তাই ডাল রাঁধতে হোলো,

একটা ভাজাও করতে হোল। তারপর মনে করলাম, এতই যদি হোলো, তা হলে আর একটু তরকারী রাঁধতেই আর কতটুকুই বা সময় লাগবে। এখন এই ভাতটা চড়িয়ে দিয়েছি; নামলেই কর্ত্তার ভাত দিই।"

"তা মা, এতই যদি হয়েছে, তবে আর একটু সুক্তুনি করতেই বা কতক্ষণ, তারপর একটা অম্বল, সে আর কয় মিনিটের কাজ। এমনই করতে-করতে রাত পুয়িয়ে যাক্; তা হলেই খাওয়া হবে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "কা'ল থেকে আর রাত হবে না। রমেশ, তুমি না বল্লে, তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দিয়ে এসেছ। তা হলে বাছা, তোমারও খাওয়া হয় নাই বল্লে হয়। তুমিও দুটো খেয়ো।"

"মা, তুমি কি অন্নপূর্ণা হয়েছ? রেঁধেছ ত তিনজনের জন্য; এদিকে বল্ছ, রমেশ তুমিও দুটো খাও। তার পর!"

"ওরে পাগল ছেলে, কর্ত্তার ভাত বেড়ে দিয়ে, আর দুটো চা'ল তুলে দিয়ে নামাতে কতক্ষণ! তাই হবে, তোমাকে বাছা দুটো খেতেই হবে। তুমি যদি কষ্ট করে এ সব না এনে 'দতে, তা হলে আজ যে খাওয়াই হোত না।"

"তাই বুঝি মা, ধার শোধ দিতে চাও।"

এই রকম কথাবার্ত্তায় রান্না শেষ হইল। বড় কর্ত্তা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিল। তিনি আহার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীকে

রান্নাঘরের মধ্যে ভাত দিয়া, বড় গিন্নী একখানি থালায় করিয়া ভাত বাড়িয়া বারান্দায় আনিয়া দিলেন।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "বেশ বেশ, রমেশকে খেতে বলেছ, বেশ করেছ। কিন্তু কি দিয়ে খাবে।"

"কেন, হাত দিয়ে খাব। আমি ত খেয়েই এসেছি। মা ঠাকরুন ছাড়লেন না। তাই প্রসাদ পেতে বসেছি।"

রমেশ খাইতে খাইতে বলিল, "মা ঠাকরুণ, এমন ডাল কখনও খাই নি মা! ডাল নয়, যেন অমৃত।"

"আর একটু ডাল দেব বাবা!"

"ঐ শোন কথা। তিন জনের মত রান্না, তার মধ্যে আমি এসে ভাগ বসালাম; এখনও বলেন 'আর একটু দেব।' দেবে যে মা! তার পর, নিজের কি হবে?"

"বাছা, আমাদের কিছু না হলেও পেট ভরে।"

"সে আজ আর কাজ নেই। আর একদিন এমনই করে ডাল রাঁধতে হবে,সেদিন দেখাব,এই রমেশ জানা কেমন খেতে পারে।"

রমেশ আহার শেষ করিয়া উঠিতে যাইবে, তখন বড় গিন্নী বলিলেন "রমেশ, বাবা উঠো না; একটু মিষ্টি দেব।"

"মা গো, ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে পড়েছিলাম, এখনও মনে আছে, 'অধিক অমৃত খাইলে পীড়া হয়'; শেষে কি মারা যাব।"

"না, না, রমেশ, একটু মিষ্টি খাও। তোমার মনিবই দিয়ে গেছেন।" এই বলিয়া দুইটা পেড়া ও খানিকটা রাবড়ি রমেশের পাতে দিয়া গেলেন।

রমেশ, বলিল, "আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম, দেখ দেখি, মা পেলাম, বোন পেলাম—দরদের লোক পেলাম। আমি ঠিক বল্‌ছি মা ঠাকরুণ, পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমার মা ছিলে ; নইলে এই কয় ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হয়।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তোমার মত ছেলে পাওয়া অনেক তপস্যার ফল।"

সকলের আহারাদি শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল, "তুমি তা হলে আমার দাদা হলে। এখন থেকে তোমাকে রমেশ দাদা বলেই ডাক্‌ব। তুমি যে গান শোনাবে বলেছিলে, তা আমার মনে আছে। একটা গান কর।"

রমেশ বলিল "আজ অনেক রাত হয়েছে দিদি লক্ষ্মী, আজ আর গান শুনে কাজ নেই ; আজ শোও। রমেশ ত বাঁধাই পড়েছে। কত গান শুন্‌তে পার, কাল থেকে দেখ্‌ব।"

বড় গিন্নীও বলিলেন "লক্ষ্মী, কাল রেলে ত ঘুম হয় নাই, পরশুও তাই। আজ এখন শোও, একে শরীর ভাল নয়, তার পর এই অনিয়ম।"

সকলে শয়ন করিলেন। রমেশের আর ঘুম আসে না। সে গান ধরিল—

"যার মা আনন্দময়ী, তার কেন নিরানন্দ।
তবে কেন শোকে দুঃখে নিরাশায় সদা কাঁদ।"

১৪

পরদিন সত্যবাবু একজন হিন্দুস্থানী ঝি পাঠাইয়া দিলেন। সে বাজারহাট করিবে এবং দুই বেলা বাসন মাজিয়া ও অন্যান্য কাজ করিয়া দিয়া যাইবে; মাসে তাহাকে দুইটী করিয়া টাকা দিতে হইবে। রমেশ কয়েক দিন রাত্রিতে আসিয়া এই বাড়ীতেই থাকিবে, সত্যবাবু এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রমেশ কিন্তু যখনই একটু অবকাশ পায়, তখনই এই বাড়ীতে আসে, এবং বাজার-হাট করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে আসিয়া দেখে, সকলেই তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। রমেশ বলিল "আজ এত শীগ্‌গিরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমরা ত এ-বেলা রাঁধি নেই; কর্ত্তা রাত্রে ত কিছু খান না, লক্ষ্মীও খায় না। আমরা এ-বেলা জল খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আজ আর আরতি দেখ্‌তে যাওয়া হোলো না।"

"কেন, ঝিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে মা!"

বড় গিন্নী বলিলেন "বাড়ীতে লক্ষ্মী একেলা কি থাকৃতে পারে? তার শরীর ভাল নয়। কা'ল এতখানি পথ হেঁটে তার অসুখ

বোধ হয়েছিল; তাই আজ তার যাওয়া ঠিক মনে হোলো না, আমরাও যেতে পারলাম না।"

"সে কথা আমাকে বল্‌লেই পারতে মা! আমি এসে তোমাদের নিয়ে যেতাম, দিদি লক্ষ্মীর কাছে ঝি থাকৃত। যাক্‌, কা'ল থেকে সে ব্যবস্থা করা যাবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, তোমার আর কে আছে?"

"আমার? আমার কেউ নেই—আমি একেলা মানুষ।"

"বৌ, ছেলে-পিলে, মা-বাপ, কেউ নেই?"

"না দিদি লক্ষ্মী, কেউ নেই।"

"সবাই মারা গেছে?"

"মা বাবা মারা গেছে। আমি যখন তিন বছরের, তখন এই কাশীতেই বাবা মারা যান। মা বাবা আমাকে নিয়ে তীর্থ করতে এসেছিল; এখানে এসেই বাবা মারা গেল। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। মা আর দেশে গেল না; আমাকে নিয়ে এখানেই থাকৃল। তার পর আমার বয়স যখন দশ বছর কি এগার বছর, তখন মাও মারা গেল। তখন আর কি, আমি একেলা। এই ছয় সাত বছরে মার হাতে যা ছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মা এক বাড়ীতে দাসীর কাজ করত, তাতেই আমাদের চলে যেত। সেই সময় আমি একটু বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখি, বুঝলে দিদি লক্ষ্মী! মা মরে গেলে আমি আর কি করব,—এই চাকরী আরম্ভ করে দিলাম। আজও চাকরী কালও চাকরী—এই চল্লিশ বছর চাকরীই করছি—এই কাশীতেই আছি।"

লক্ষ্মী বলিল, "তার পর বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করলে না কেন ?"

"এই শোন কথা। ঘর-সংসার! ঘর-সংসার কি আর আমি দেখিনি। কত লোকের বাড়ী কাজ করেছি; কত জনের ঘর-সংসার দেখেছি। সেই সব দেখেই আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল;—রমেশ জানা আর ও পথে গেলেন না, মাঠাকরুণ।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সে কি আর ভাল হয়েছে রমেশ!"

"ভাল, খুব ভাল হয়েছে মাঠাকরুণ! সংসারের কোন জ্বালা ভুগতে হয় নাই। তা হলে কি এই রমেশ ছেলেকে পেতে মা! তা হলে দেখ্‌তে, একটা পাজী, জোচ্চোর, চোর, রমেশ। আমি বেশ আছি মা—কোন গোল নেই। এই আজ পঞ্চাশ বছর হোলো—এই কাশীর মত যায়গায়ই ত কাটালাম; কিন্তু, কেউ বল্‌তে পারে না যে, রমেশ জানা কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করেছে। মদ-ভাঙের ত কথাই নেই, রমেশ তামাকটুকু পর্য্যন্ত কোন দিন খায় নেই। এই পান যে কি জিনিস, তা তোমার ছেলে একদিনের তরেও মুখে দিয়ে দেখে নাই। তার পর এই কাশীশুদ্ধ লোককে সুধিয়ে দেখো, তোমার এই ছেলের কোন বদ্ চাল কেউ কোন দিন দেখেছে কি না। কোন খেয়াল এই রমেশ জানার নেই। তাই সে ছুনিয়ায় কাউকে ডরায় না। এত যায়গায় কাজ করেছি, কেউ বল্‌তে পারবে না যে, রমেশ কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছে, কারও দিকে বদ্ নজরে চেয়েছে। এমন মায়ের পেটে রমেশ জন্মে নেই মা!"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা রমেশ দা, তুমি যে এই এতকাল চাকরী করেছ, মাইনে ত পেয়েছ; সে সব টাকা কি করলে ?"

"কি আবার করব; সব টাকা জমিয়ে রেখেছি। শুন্‌বে দিদি লক্ষ্মী, এখানে রামপ্রতাপ নেকামল বাবুর কুঠী আছে;—ভারি বড় কুঠী। সেই কুঠীর বাবুরা আমাকে বড় ভালবাসে; কুঠীর বুড়া-কর্ত্তা নেকামল বাবুর কাছে আমি অনেক দিন ছিলাম কি না; যা মাইনে পেতাম, তা সব সেখানে জমা রাখতাম।"

"সেখান থেকে ছেড়ে এলে কেন ?"

"সে কথা আর শুনো না; মনিবের কি নিন্দে করতে আছে ? মনিব ত ভালই ছিল; বাড়ী বড় বদ্ধ। যাক্ গে, সেখান থেকে ছেড়ে এলাম। কিন্তু টাকা আর তুলে আন্‌লাম না। অত বড় কুঠী, টাকা কি আর মারা যায়। তার পর যখন যা রোজগার করেছি, সব ঐ কুঠীতে রেখে দিয়েছি—এখনও রেখে দিই।"

"আচ্ছা, সেখানে কত টাকা হয়েছে রমেশ দা !"

"রমেশ দা তারই হিসেব করতে যায় কি না ! ও সব হিসেব-টিসেব আমরা নেই। যা পাই রেখে আসি;—ওরা ঠকাবার লোক নয়। এই আর বছর ওদের বড় বাবু আমাকে ডেকে বল্‌লেন, 'রমেশ, তোমার অনেক টাকা জমেছে; এ টাকা কি করবে ?' আমি বলিলাম আরও জমুক, শেষে একদিন তুলে

নিয়ে একটা ভাল কাজে লাগাব। বড় বাবু বললেন 'টাকা যে অনেক হয়েছে, সুধু আসল ত নয়, সুদও জম্‌ছে।' শুন্‌লে দিদি লক্ষ্মী, ওরা কেমন খাঁটি লোক—সুদ পর্য্যন্ত হিসেব করে জমিয়ে রাখ্‌ছে। সেই দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'আচ্ছা বড় বাবু, আপনারা যে টাকা-টাকা করেন, আমার এমন কি নয়-শ পঞ্চাশ টাকা জমেছে।' বড় বাবু বলিলেন, 'নয়-শ পঞ্চাশসে বহুত জিয়াদা, দো হাজারসে উপরি হোগা!' আমি মনে করলাম বড় বাবু তামাসা করছেন। তিনি আমার মনের কথা বুঝে বললেন, 'মস্‌করা নেহি রমেশ, দো হাজারসে যাস্তি হোগা।' হোগা ত হোগা! তার পর আর খোঁজ নিইনি। বুঝলে দিদি লক্ষ্মী, আমার এত টাকা কি করে হোলো, তাই এক-এক দিন ভাবি। চুরী ত করি নেই কোন দিন, কাউকে ঠকিয়ে এক পয়সাও কখন নিইনি।"

লক্ষ্মী বলিল, "এতদিন থেকে কাজ করছ রমেশ দা, তা সুদে-আসলে দু-হাজার টাকার উপর হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! আচ্ছা তোমার ত কেউ নেই, তুমি এ টাকা কি করবে?"

রমেশ বলিল, "এই একটা কিছুতে দিয়ে যাব মনে করেছি।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, আমি বলি কি, তুমি একটা বিয়ে কর। চিরকালটা ত এই একভাবে কাটালে; এখন ঘর-সংসার কর। শেষকালে দেখবার-শুনবার লোক হবে।"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "বয়স হয়েছে কত, জান দিদি লক্ষ্মী!

পঞ্চাশ হয়ে গেছে। এতকাল যে দেখেছে, শেষের কয়টা দিনও সেই দেখ্‌বে। বেশ আছি দিদি! বেশ আছি। খাই-দাই, কাজকর্ম্ম করি, কোন ভাবনা নেই—ও সব জঞ্জালে রমেশ জানা যাচ্ছে না।”

বড় কর্ত্তা এতক্ষণ এই সকল কথোপকথন শুনিতেছিলেন; কোন কথাই বলেন নাই। এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, “লক্ষ্মী, কাকে কি উপদেশ দিচ্চ। রমেশ আমাদের মত মানুষ নয়—ও শাপভ্রষ্ট দেবতা। কলিকালে এমন জিতেন্দ্রিয়, এমন নির্লোভী পুরুষ যে থাক্‌তে পারে, তা আমি জানতাম না। লেখাপড়া না জান্‌লেই যে মানুষ হয় না, তা নয়;—এই রমেশ একেবারে মূর্ত্তিমান শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, বুঝলে মা!”

“ঠাকুর মশাই, কাশীতে এসেও পণ্ডিতি ছাড়লেন না। দিদি লক্ষ্মী, ওঁর কথা শুনো না। এই রমেশ যে দেখ্‌ছ, এ শাস্ত্রও নয়, কিছুই না—একটা অপদার্থ—একটা সং। কতজন কত সং সেজে বেড়ায়, রমেশও একটা সং সেজে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে কেউ হাসে, কেউ ঠাট্টা করে, কেউ পাগল বলে। শোন দিদি, একটা গান শোন।—ওস্তাদের গান—একেবারে মনের কথা বলা গান।”—এই বলিয়া রমেশ গান ধরিল—

“কারে তুই দেখে রে সং, বল্‌ দেখি মন!
হাসিস্‌ এমন হা হা করে।

সংসারে সকলেই সং, ভেবে দেখ মন,
সংসারে সং, ছাড়া নেই রে ;
কেহ বা সংসার ত্যেজে সং সেজেছে,
সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হলি যখন, তখনি সং
সাজিলি মন, ভেবে দেখ্ রে ;
কাটালি শিশু-বেলা, করে খেলা,
মেখে ধূলা সব শরীরে।
যৌবনে ঘোর সংসারী, চির বেড়ি
পায়ে পরি বেড়াস ঘূরে ;
আবার তোর এ কি সাজা, পরের বোঝা
বস্ রে সদা লয়ে শিরে।”

বড়কর্ত্তা বলিলেন, “রমেশ, এ গান তুমি কোথায় শিখ্‌লে ? এ যে আমাদের দেশের গান। এ গানে যে এক সময় আমাদের অঞ্চল ভেসে গিয়েছিল। যে মহাপুরুষ এই সকল গান বেঁধেছিলেন, তাঁকে আমরা দেখেছি। এ গান কাশীতে পর্য্যন্ত এসেছে।”

রমেশ বলিল, “তাঁরা যে দেবতা। তাঁদের কথা কি এক গাঁয়ে আট্‌কে থাকে, বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসে। এখন কাশীতে কত ভিকিরী ঐ সব গান গায়। আমিও অনেক গান জানি, আজ রাত হয়ে গেল দিদি লক্ষ্মী, শোও গে। রমেশের গান কত শুন্‌বে—শেষে জ্বালাতন হয়ে যেতে হবে।”

লক্ষ্মী বলিল, “সে ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না।”

১৫

ইহার দুই একদিন পরে সত্যবাবু আসিয়া বড় কর্ত্তাকে বলিলেন যে, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সেইদিনই কলিকাতায় যাইতে হইবে। তিনি রমেশকে ভাল করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; সে সর্ব্বদা তাঁহাদের তত্ত্ব লইবে এবং যতদিন তিনি ফিরিয়া না আসেন, ততদিন রমেশ এই বাড়ীতেই রাত্রিতে থাকিবে।

সত্যবাবুকে আর ফিরিয়া আসিতে হইল না। তিন চার দিন পরেই সংবাদ আসিল যে, গাড়ীতে যাইবার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া গাড়ীর মধ্যেই তাঁহার জ্বর হয়, এবং সেই জ্বরেই দ্বিতীয় দিনে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া কাশী হইতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা দেশে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রমেশকে সঙ্গে লইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; রমেশ সম্মত হয় নাই,—সে কাশী ছাড়িয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আর কোথাও যাইবে না।

সত্যবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই কাশীর বাড়ী-ঘর ও কন্‌ট্রাক্‌টের কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কন্‌ট্রাক্‌টের কাজের ভার অপর একজনের উপর ন্যস্ত করিয়া কাশীর বসত-বাড়ী ভাড়া দিবার

ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রমেশকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলেন, কারণ কাশীতে তিনি আর আপাততঃ বাসা রাখিবেন না; যে একজন সরকার ছিল, সেই মাত্র থাকিবে। রমেশ এই কথা শুনিয়া সত্যবাবুর পুত্রকে বলিল "বড়বাবু, এতদিন কাশীতেই আছি। এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। আর কোনখানে একটা কাজ কর্ম্ম জুঠাইয়া লইব।" সুতরাং রমেশের চাকরী গেল।

এই সংবাদ শুনিয়া বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তুমি ত ওখানে চার-টাকা মাইনে পেতে। আমরাও তাই দেব; তুমি আমাদের কাছেই থাক। ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিই। দুইজনের দরকার কি। বাড়ীর যে কাজকর্ম্ম, তা আর তোমাকে করতে হবে না; সে আমরাই করে নেব। তুমি আমাদের কাছেই থাক।"

রমেশ বলিল, "মা ঠাকরুণ, এখানে যে থাক্‌ব, তা আমিই স্থির করেছি। তোমরা না বল্‌লেও থাক্‌তাম; কিন্তু একটা কাজ করতে হবে মা, আমাকে মাইনে দিতে পারবে না;—ছেলে কি মায়ের সেবা করে মাইনে নিতে পারে, না মা-ই তা দিতে পারে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক; কিন্তু তোমারও ত শেষ ভাবতে হয়; দুপয়সা হাতে থাক্‌লে, সবাই ডেকে জিজ্ঞাসা করবে। আমাদের ভরসা কি বল?"

"মা গো, রমেশ সে ভাবনা কোন দিনই ভাবে নাই। সে

জন্য তোমাকেও চিন্তা করতে হবে না। এতদিন ত কত লোকের মাইনে নিয়ে চাকরী করে দেখলাম; এতদিন পরে যদি বিনা-মাইনের একটা কাজ জুটে গেল, তখন ছাড়ি কেন? দুবেলা দুটো প্রসাদ দেবে—এই কথা।"

বড় কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রমেশ, তুমিই বিবেচনা করে দেখ, আমাদের যখন শক্তি আছে, তখন তুমি নেবে না কেন?"

"নেব না কেন, তা আপনি বুঝবেন না। টাকাই কি বড় হোলো কর্ত্তা মশাই! এত ভালবাসার কি একটা দাম নেই। সেই দাম দিয়ে যে আপনারা আমাকে এই কয়দিনের মধ্যেই কিনে ফেলেছেন, তা জানেন?"

বড় কর্ত্তা আর কথা বলিলেন না। কাশীতে আসিয়া সত্যসত্যই এই এক অমূল্য রত্ন তাঁহাদের লাভ হইল।

বড় কর্ত্তা কাশীতে পৌছিয়াই হরেকৃষ্ণকে পৌছা সংবাদ দিয়াছিলেন; হরেকৃষ্ণও তাহার উত্তর দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সত্যবাবুর ন্যায় ভদ্রলোকের আশ্রয় ও সাহায্য পাইয়াছেন, এ সংবাদ পাইয়া হরেকৃষ্ণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পর লক্ষ্মীর অদৃষ্টে যা থাকে, সে পরের কথা। এখনও ত পাঁচ-ছয় মাস বিলম্ব আছে।

হরেকৃষ্ণ একদিক হিসাব করিয়া পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব দেখিলেন; কিন্তু বিধাতা আর একদিক দিয়া যে তাঁহাকে অকূলে ভাসাইবেন, সে কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কাশীতে আসিবার পর প্রায় একমাস চলিয়া গেল। রমেশ কাজকর্ম্ম করে;—কোনই অসুবিধা নাই।

এই সময় কাশীতে ভয়ানক ওলাউঠা দেখা দিল। দেখিতে-দেখিতে সহর-ময় এই কাল ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। যাহাদের অন্য কোথাও আশ্রয় ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল; এমন কি যাহারা কাশীবাস করিতেই আসিয়াছিল,—কাশীতে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই যাহাদের কামনা ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে কাশী ত্যাগ করিল। চারিদিকে একটা আতঙ্ক, একটা হাহাকার উঠিল।

রমেশ নিজের জন্য ভাবিল না; কিন্তু তাহার ভয় হইল; এই ব্রাহ্মণ পরিবারে যদি কাল ব্যাধি প্রবেশ করে। এই বাড়ীর একজন গেলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে। রমেশ কি করিবে; যথা-সাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিল; আহারাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিল।

কিন্তু বিধাতা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা ত মানুষের হাতে নাই; মানুষ সাবধান হইতে পারে, কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইবেই,—কেহই তাহা আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন শেষ-রাত্রিতে বড় গিন্নী রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রাতঃকালেই রমেশ তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলেন; কিন্তু সে সময় আর ঔষধে কোন ফল হইতেছিল না; যাহাকে এই কাল ব্যাধি ধরিতেছিল, সে

আর রক্ষা পাইতেছিল না। দ্বিপ্রহরের সময়ই বড় গিন্নীর অবস্থা খারাপ হইল। বড় কর্ত্তা বলিলেন "রমেশ, আর ডাক্তার ডাকিয়া কোন লাভ নাই। তুমি এক কাজ কর, হরেকৃষ্ণকে একটা টেলিগ্রাফ করে দেও; কিন্তু তাকে আসতে নিষেধ করিও।"

বড় গিন্নী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরপোকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করছে বটে, কিন্তু কাজ নেই; তাকে খবর দিও না। সে খবর পেলেই ছুটে আস্‌বে। এখন এসে কাজ নেই। তাকে দেখ্‌তে পেলাম না, তার হাতে অভাগীকে দিয়ে যেতে পারলাম না।"

রমেশ বলিল, "মাঠাকরুণ, ভয় পাবেন না। আপনি সেরে উঠ্‌বেন।"

বড় গিন্নী বলিলেন "রমেশ, সে আশা আর নেই বাপ! তোমাকে কিছুই বলে যেতে পারলাম না—সময় পেলাম না। এত শীগ্‌গিরই যে যেতে হবে, তা জান্‌তাম না। লক্ষ্মী আমার বড় অভাগিনী। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর বাপ, তাকে তুমি ছাড়বে না—সুখ-দুঃখে তাকে দেখ্‌বে। বড় ভাইয়ের মত তাকে পালন করবে। এই কথাটা আমাকে বল—আমি সুখে মরতে পারব। আর শোন লক্ষ্মী, শোন রমেশ, আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পারছি, একটু সময়ের আগে-পাছের জন্য আমি সিঁথিতে সিন্দুর নিয়ে মরতে পারলাম। কর্ত্তাও আর নেই; তিনিও আমার সঙ্গে-সঙ্গেই আস্‌ছেন। ঐ দেখ, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে বড় কর্ত্তা একবার বাহিরে গেলেন ; একটু পরেই ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "গিন্নী, তোমার কথা কি মিথ্যা হয়। মা লক্ষ্মী, আমি যে আঁধার দেখ্‌ছি ; আমাকে শুইয়ে দে মা !"

একবার ভেদ হইয়াই বড় কর্ত্তা শয্যাশায়ী হইলেন। পাশাপাশি দুই শয্যা রচিত হইল ; লক্ষ্মীর তখন আর কান্না নেই—সে উৎস তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। সে একবার মায়ের মুখে, একবার বাপের মুখে গঙ্গাজল দিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল "বাবা, বিশ্বনাথের নাম কর" "মা, অন্নপূর্ণাকে ডাক।"

রমেশ অকূল সাগরে পড়িল ; সে যে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। লক্ষ্মীকে বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, তুমি একটু একেলা থাক্‌তে পারবে। আমি এক দৌড়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাই।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "রমেশ, আর ডাক্তার ডেকে কি হবে ; এখন মুখে গঙ্গাজল দেও, আর বাবার নাম শুনাও।"

রমেশ বলিল, "সে ত আছেই ঠাকুর মশাই ! এমন করে বিনা চিকিৎসায় ত রাখতে পারি নে। দিদি লক্ষ্মী, কোন ভয় নেই। আমি যাব, আর আস্‌ব।"

বড় গিন্নী বলিলেন "রমেশ, আমার লক্ষ্মীর যে আর কেউ নেই বাবা।"

রমেশ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তারের বাড়ী গেল ; বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি যা চাইবেন, তাই দেব, একবার আসুন ; গিন্নীমাকে

তখন দেখে এসেছেন, কর্ত্তারও ঐ রোগে ধরেছে। আপনি একটীবার আসুন।"

ডাক্তার বলিলেন, "গিয়ে কি হবে বাপু, এতদিনের মধ্যে একটীকেও ত বাঁচাতে পারলাম না; সব ওষুদ বৃথা হয়ে যাচ্ছে। আর গিয়ে কাজ নেই; এই ব্যবস্থা লিখে দিচ্ছি; ওষুদ নিয়ে যাও, খাওয়াও; আয়ু থাকে, বাঁচবে। গিয়ে কোন ফল নেই।"

রমেশ অনেক মিনতি করিল; ডাক্তার আসিলেন না। রমেশ তখন ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া, মনে করিল, এঁদের বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া দরকার। যে রকম অবস্থা, তাতে কর্ত্তা গিন্নী কাহারও রক্ষা নেই। মেয়েটীকে লইয়া সে মহাবিপদে পড়িবে। এই মনে করিয়া রমেশ ডাকঘরে যাইয়া হরেকৃষ্ণকে টেলিগ্রাম করিল; তাঁহার ঠিকানা সে পূর্ব্বেই জানিত।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দুইজনেরই অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। রমেশ বলিল, "ঠাকুর মশাই, ওষুদ এনেছি; একটু খান।"

"আমার আর ওষুদে কিছু হবে না। দেখ, গিন্নীকে বাঁচাতে পার কি না। আর হরেকৃষ্ণকে একটা খবর দেও।"

রমেশ বলিল, "তাঁকে তার করেছি।"

"বেশ করেছ বাবা! এখন গিন্নীর জন্য ভাল করে চেষ্টা কর। ওঁকে না বাঁচাতে পারলে লক্ষ্মীর কি হবে?"

লক্ষ্মী বলিল, "বাবা, এখন বিশ্বনাথের নাম করুন। আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

"মা, তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। তুই যে বড় অভাগিনী।" বড় কর্ত্তার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল, "বাবা, কাতর হবেন না। ঠাকুর-দেবতার নাম করুন।"

বড় কর্ত্তা 'হুঁ' বলিয়া নীরব হইলেন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পার্শ্বের বিছানার দিকে;—সে যে কি দৃষ্টি, তাহার বর্ণনা করা যায় না। বড় কর্ত্তা এক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর একটী কথাও বলিলেন না।

বড় গিন্নী সুধু বলেন, "লক্ষ্মী, মা আমার, তোকে যে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম। ও রমেশ, বাবা, দেখ কর্ত্তা কেমন করছেন। ওঁর মুখে একটু গঙ্গাজল দে মা! হে ঠাকুর, আর কোন প্রার্থনা নেই, আমাকে আগে নিয়ে যাও—আমাকে আগে। আর ঐ হতভাগিনী —মা গো!"

লক্ষ্মীর চক্ষে জল নাই; একবার সে পিতার পার্শ্বে যাইয়া বসে, আবার যখন মাতা কেমন করিয়া উঠেন, তখন মায়ের কাছে যায়।

বেলাও যাইতে লাগিল; দুই জনের অবস্থাই ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। রমেশ দেখিল, রাত্রিও কাটিবে না,—হয় ত সন্ধ্যার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। সে তখন দুই জনেরই জীবনের আশা ত্যাগ করিল; তাহার ভাবনা, এঁদের সদ্গতির কি হইবে। রাত্রিতে সে একেলা কি করিবে? এখন হইতেই সে ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।

রমেশ বাড়ীর বাহিরে যাইয়া দেখে, তাহার পরিচিত এক বৃদ্ধ

গাঁজাখোর রাস্তা দিয়া যাইতেছে। রমেশ তাহাকে ডাকিল ;—এ সময় যে হয় একজন লোক বাড়ীতে পাইলেও তাহার ভরসা হয়।

রমেশ বলিল, "সিধু দাদা, বড় বিপদে পড়েছি ভাই! এ বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী দুইজনই যান-যান হয়েছেন। একটী মাত্র মেয়ে, আর আমি। তুমি যদি ভাই, একটু উপকার কর, তা হলে চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

"আমি কি করব—আমি যে কায়স্থ; আমি ত আর কাঁধ দিতে পারব না—আর সে ক্ষেমতাও নেই।"

রমেশ বলিল, "সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। তার ব্যবস্থা যা হয় আমি করব। তোমাকে সুধু এই বারান্দায় ব'সে থাক্‌তে হবে।"

সিধু বলিল, "তা ত পারি ভাই, তবে কথা কি জান? সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি, তারপর তামাকটুকু যে খাব, তারও পয়সা নেই। ভিক্ষে আর মেলে না; প্রায় সকল ঘরেই কান্না পড়ে গিয়েছে, ভিক্ষে কে দেয় বল?"

রমেশ বলিল, "সে জন্য তুমি ভেব না। আজ আর ভিক্ষে নাই করলে। আমি তোমায় এই চার আনা পয়সা দিচ্ছি; এর থেকে পয়সা চেরেকের ভুজা কিনে আন, আর বাকী তিন আনায় তোমার তামাক নিয়ে এস। তারপর এখানে এই বারান্দায় ব'সে থাক। তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না—সুধু ব'সে থাক্‌বে। আমি একলা মানুষ; মেয়েটীকে এ অবস্থায় ফেলে ত কোন কিছুই করতে পারব না।"

সিধু বলিল, "বেশ, তা পয়সা দেও।"

রমেশ তাহাকে চারি আনা পয়সা দিয়া বলিল, "যাও ভাই সিধু, শীগ্‌গির ফিরে এস। পালিও না যেন।"

সিধু বলিল, "আরে তুমি কও কি! রাধামাধব! নেশা করি বলে কি, আর ধর্ম্মজ্ঞান নেই। আমি এখনই আস্‌ছি।" এই বলিয়া সিধু চলিয়া গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া বলিল, "এই দেখ ভাই, আমি এসেছি। দেখ, একটু আগুনের ব্যবস্থা করে দেও, আর কিছুরই দরকার নেই।"

সিধুকে পাইয়া রমেশের ভরসা হইল। সিধু বারান্দায় বসিয়া রহিল। রমেশ একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিল। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই।

সন্ধ্যার সময় বড় কর্ত্তা বেশী কাতর হইয়া পড়িলেন। রমেশ একটু-আদটুকু নাড়ী দেখিতে জানিত। সে দেখিল, বড় কর্ত্তার নাড়ী ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে; গিন্নীর নাড়ী যেন একটু সবল! সে তখন চুপে-চুপে লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, কর্ত্তার অবস্থাই বেশী খারাপ।"

কথাটা বড় গিন্নীর কাণে গেল, অথবা তিনি ভাবেই কথাটা বুঝিয়া লইলেন; বলিলেন, "রমেশ, তা ত হবে না—হতে পারে না বাবা! আমাকেই যে আগে যেতে হবে।"

রমেশ বলিল, "ও কি বল্‌ছেন মা! আপনার নাড়ী বেশ ভাল। আপনার কোন ভয় নেই।"

বড় গিন্নীর কথা জড়াইয়া আসিতেছিল; তিনি বলিলেন, "ভয়

আর নেই বাবা। একটা কাজ কর, ওঁর পায়ের ধুলো এনে আমার মাথায় দেও। আমার যে উঠবার শক্তি নেই।”

লক্ষ্মী তাহাই করিল। বড় গিন্নী একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আঃ! শরীর জুড়িয়ে গেল;—রোগ ত আর নেই মা!” রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “বাবা রমেশ, আবার বল্‌ছি, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর বাবা, লক্ষ্মীকে তুমি দেখ্‌বে। ওর কথা ত তোমাকে কিছুই বল্‌তে পারলাম না। বড় পোড়া কপাল ওর বাবা! তুমি ওকে ঘৃণা কোরো না। মেয়ে আমার সতীলক্ষ্মী। ওকে আশ্রয় দিও বাপ। লক্ষ্মী, একটু সরে বোসো মা! ওঁকে একবার ভাল করে দেখ্‌তে দাও—একবার শেষ দেখা দেখে নেই। রমেশ, লক্ষ্মীকে তোমার হাতে—”

আর কথা বাহির হইল না; দুইটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সতী-শিরোমণি স্বামীর দিকে চাহিয়া চিরদিনের জন্য নীরব হইলেন।

লক্ষ্মী এতক্ষণও ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল; এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না;—“মা, মাগো” বলিয়া মায়ের বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িল।

তাহার চীৎকারে বড় কর্ত্তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই ছিলেন; কিন্তু কিছুই এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন অতি ক্ষীণ, অতি কাতর স্বরে বলিলেন “গিন্নী, আগেই গেলে। যাও—আমিও আস্‌ছি—এখনই আস্‌ছি। ভাই হরেকৃষ্ণ! ভাই রে!”

সব শেষ হইয়া গেল। দুই মিনিট আগে-পাছে দুইটী আত্মা চলিয়া গেল।

রমেশ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিল; এমন মরণ ত সে কখন দেখে নাই। এ যে সহমরণ,—এ যে যুক্তি করিয়া প্রস্থান!

রমেশ কাঁদিয়া উঠিল; "দেবতা, এই দেখাবার জন্য কি কাশী এসেছিলে;—এরই জন্য কি রমেশকে ডেকে এনেছিলে—এত আদর করেছিলে।"

রমেশ মাটীতে বসিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল; লক্ষ্মীও মায়ের বুকের উপর পড়িয়া রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; ঘর অন্ধকার! এই অন্ধকারে দুইটী মৃতদেহ লইয়া ঘরের মধ্যে দুইটী প্রাণী!

সিধু বাহিরেই বসিয়া ছিল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া এবং ঘরের মধ্যে আলো না দেখিয়া সে ডাকিল, "ও রমেশ ভাই, অন্ধকার ঘরে বসে কি করছ। ওঠো, আলো জ্বাল। সব শেষ হয়ে গেছে না কি। ও রমেশ!"

সিধুর ডাকে রমেশের চমক ভাঙ্গিল। সে ডাকিল,"দিদি লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মীর তখন উত্তর দিবার শক্তি ছিল না; রমেশের ডাক তাহার কর্ণে গেল; কিন্তু সে কথা বলিতে পারিল না।

রমেশ আর কিছু না বলিয়া সেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়া হারিকেন লণ্ঠন পাইল; কিন্তু দিয়াসলাই কোথায়, তাহা খুজিয়া পাইল না। লক্ষ্মীকে এজন্য বিরক্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে লণ্ঠনটী হাতে করিয়া বাহিরে আসিল।

সিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, ওদিকে সব শেষ বুঝি।"

রমেশ বলিল, "সব শেষ সিধু দা! তোমার কাছে দিয়াসলাই আছে? আলোটা যে জ্বাল্‌তে হবে।"

সিধু বলিল "আছে বই কি।"

রমেশ আলো জ্বালিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেল; দেখিল লক্ষ্মী সেই একই ভাবে মায়ের বুকের উপর পড়িয়া আছে।

রমেশ বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, ওঠ, আর কেঁদে কি করবে। যা করতে কাশীতে এসেছিলে, তা হয়ে গেল। হতভাগা রমেশকে যা দেখাতে এনেছিলে, তা দেখ্‌লাম। এখন আর কাঁদবার সময় নেই। সে সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে। দেবতাদের সৎকারের আয়োজন ত করতে হবে। বাসি মড়া রমেশ বেঁচে থাক্‌তে হতে দেবে না। এই রাত্রেই যেমন করে হোক সৎকার করতে হবে।"

লক্ষ্মী এইবার উঠিয়া বসিল। এখন ত কাঁদবার সময় নয়। পিতামাতার শেষ কাজ ত তাহাকেই করিতে হইবে। তার পর,—তার পর—সব অন্ধকার!

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, এই রাত্রে কি উপায় হবে?"

রমেশ বলিল, "সে জন্য ভাবনা নেই, দিদি লক্ষ্মী! সৎকারের কথা বল্‌ছ ত? সে আমি এখনই ঠিক করে ফেলছি। এই রাত্রিতেই সে ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু একটা বড় ভাবনায় পড়েছি। এমন যে হবে, তা ত ভাবিনি। তা হলে দিনের বেলাতেই কুঠীতে গিয়ে টাকা আন্‌তে পারতাম। এখন ত

পাওয়া যাবে না। হাতে যা ছিল, সে সব খরচ হয়ে গেছে; সামান্য কয় গণ্ডা পয়সা আছে। যাক্, তারও ব্যবস্থা করছি। তুমি একেলা একটু থাক্‌তে পারবে। বাইরে সিধু রইল, কোন ভয় নেই। আমি যেমন করে হোক্, টাকা আর বামুন নিয়ে আস্‌ছি। আমার দেরী হবে না।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, টাকার জন্যে ভেব না। মায়ের বাক্সে অনেক টাকা আছে। কত লাগ্‌বে বল, বের করে আনি। সব টাকাই এনে তোমার কাছে দিই; তুমি যা হয় কর। আমি একেলা থাক্‌তে পারব। ভয় কিসের—ওঁরা যে আমার মা আর বাবা! বাবা গো!" বলিয়া লক্ষ্মী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

রমেশ বলিল, "কেঁদ না দিদি লক্ষ্মী! সব টাকা কি হবে? গোটা পঞ্চাশেক বার করে দেও। এই মড়িপোড়া বামুনগুলোর এখন মরসুম পড়েছে কি না; তাতে রাত্রিকাল। পাঁচ-পাঁচ টাকার কমে কেউ যেতে রাজি হবে না। যেমন করে হোক আট দশজন বামুন ত লাগ্‌বে। সে আমি জোগাড় করে আন্‌তে পারব।"

লক্ষ্মী তখন বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা আনিয়া দিল; তখন আর তাহার টাকা গণিবার ইচ্ছা হইল না।

রমেশ বলিল "টাকাগুলো গণে দেখি, কি জানি শেষে কম না পড়ে।" সে গণিয়া দেখিল ৭১ টাকা। "এতে ঢের হবে। বাক্সে আর কিছু রইল কি?"

লক্ষ্মী বলিল, "আরও আছে।"

রমেশ বলিল, "রাতটা কেটে গেলেই হয়; তার পর আমি টাকা আনতে পারব।"

দ্বারের কাছে যাইয়া সিধুকে বলিল, "সিধু ভাই, তুমি এই দুয়ারটীর কাছে এসে বোসো; দিদি লক্ষ্মী একেলা থাকতে ভয় না পায়।"

সিধু বলিল, "ভয় কিসের আমি এই দোর-গোড়ায় বসে রইলাম। যাও রমেশ, বেশী দেরী কোরো না। তোমার ত আর এ কাশীর কিছুই অজানা নেই। ঐ রামাদের আড্ডায় যেও; সেখানে ঢের লোক পাবে।"

রমেশ বলিল, "সেখানেই যাচ্ছি। তুমি সিধু দা! এদিকে একটু নজর রেখো।"

সিধু বলিল, "সে আর আমাকে বলতে হবে না, তুমি যাও।"

রমেশ তখন দশটা টাকা টেঁকে গুজিয়া বাকী টাকা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া লইল; বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, আমি সব ঠিক করে লোকজন নিয়ে এখনই আসব। এখানকার সব আমার চেনা, একটুও দেরী হবে না। দেখো ভাই সিধু।" বলিয়া রমেশ বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মী দুইটা মৃতদেহ দুইপাশে লইয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

রমেশ যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই করিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বড় একখানা খাট ও দশজন বামুন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

এরা রামার দল। দলের সর্দ্দার রামাও আসিয়াছিল;—

রমেশের কাছে তাহারা কত সময় কত উপকার পাইয়াছে ; আর এই অসময়ে, বিপদে তাহার সাহায্য করিবে না। তবে পয়সা,—সে কি আর ছাড়া যায় ;—এ যে তাহাদের ব্যবসায়।

রামা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দুইটী মৃতদেহ দেখিয়া বলিল, "রমেশদা! এ যে হরগৌরী দাদা! এতদিন এই কাশীতে এত মড়া পুড়িয়েছি, এমন ত দেখি নেই।" এই বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিল "দেখ্, ব্যাটারা, এতদিন অনেক মড়া পুড়িয়েছিস্ ; আজ যাদের পোড়াবি, তেমন কোন দিন দেখিস্ নি—একেবারে হরগৌরী। কি বল্ব, রাত্রি, নইলে সমস্ত কাশীধাম ঘুরিয়ে নিয়ে যেতাম—লোকে দেখ্ত কেমন মরণ।"

রমেশ সেই সময় বাহিরে আসিয়া বলিল, "রাম, তোদের সঙ্গে ত কোন কথা হয় নাই ; ডেকেছি, আর এসেছিস্। এখন বল, তোরা দশজনে কত নিবি। কিন্তু বলে দিচ্ছি ভাই, ঘাটে নিয়ে ফেলেই পালাতে পারবি নে। দেখ্ছিস্ ত এঁরা ব্রাহ্মণ। আমি ত আর ছুঁতে-করতে পারব না। থাক্বার মধ্যে আছে ঐ একটী মাত্র মেয়ে। ও আর কি করবে? তোদেরই সব করতে হবে, বুঝলি।"

রামা বলিল, "সব বুঝেছি দাদা! কিন্তু কি করব, এই আমাদের পেশা ; নইলে কি টাকা চাই। তা দেখ, এই রাত্রে, আর আজকালকার এই দিনে জন-প্রতি পাঁচ টাকার কমে

কেউ কাঁধ দিত না। তবে, একে তুমি আমাদের কত উপকার করেছ, তার পর এমন হরগৌরী। যাক্, তুমি আমাদের তিনটী করে টাকা দিও। দেখ্ বেটারা, কেউ এতে আপত্তি করিস্ নে। টাকা ঢের পেয়েছি, বেঁচে যদি থাকি, আরও কত পাব; কিন্তু এমন মড়া হয় ত আর কাঁধে করতে পারব না। আজ তোদের জন্ম সফল হয়ে যাবে। এই কথা রইল, রমেশদা, কি বল?”

রমেশ বলিল, “বেশ, তাই দেব। আর দেরী করিস্ নে; রাত প্রায় নটা বাজে।”

তখন সকলে ঘরের মধ্যে গেল। রামা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক; এমন মৃতদেহ—এমন হরগৌরী একসঙ্গে, এক খাটে শয়ন করাইয়া তাহারা কোন দিন শ্মশানে লইয়া যায় নাই।

রামা বলিল “কেমন, যা বলেছি, ঠিক কি না। দেখ্, তোদেরও মা-বাপ ছিল, কারও বা এখনও আছে। আজ ঠাট্টা-তামাসা করতে কেউ পাবিনে। আজ মনে কর্, তোদেরই বাপ-মা মরেছে; তোরা তাদেরই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিস্। তা যদি না পারিস্, ঘাটে গিয়ে যদি মদ-গাঁজা চালাতে চাস্, তা হলে সরে পড়্। আমি দোসরা লোক নিয়ে আস্‌ছি।”

সকলেই সমস্বরে বলিল “না, না, আমরা আমাদের বাপ-মাকেই আজ নিয়ে যাচ্ছি, কোন বেয়াদবি করব না।”

রামা তখন রমেশকে বলিল “রমেশ দা, আমরাও ব্রাহ্মণের ছেলে। লেখাপড়া শিখি নাই; বদ্ সঙ্গে পড়ে, আর এই

কাশীর কৃপায় বদ্‌মায়েস হয়েছি ; গুণ্ডামি করি, মদ-গাঁজা খাই, আরও কত কি করি ;—কিন্তু তবুও আমরা ব্রাহ্মণের ছেলে। আজ তুমি আমাদের যা বইতে এনেছ, এমন দেখিনি। শোন, এত রাত্রে ত আর সহর ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই ; কিন্তু একটী কাজ করতে হবে দাদা! এই দেবতাদের ধূপ, ঘি আর চন্দন-কাঠ দিয়ে দাহ করতে হবে। আমাদের টাকা আজ দিতে না পার, নাই পারলে, আর একদিন দিও ; সেই টাকা দিয়ে আজ এই সব করতে হবে।”

দলের মধ্যের দুই তিনজন বলিয়া উঠিল, “চাই নে আমরা টাকা—আমরা টাকা নেব না। আজ এঁদের চন্দন-কাঠ দিয়ে, ঘি দিয়ে দাহ করব। আমাদের কিছু দিতে হবে না ; টাকা আমরা অনেক রোজগার করতে পারব।”

সকলেই বলিয়া উঠিল “নেব না টাকা!”

লক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে পারিল না ; সে কাঁদিয়া উঠিল,—“বাবা গো, মা গো, একবার চেয়ে দেখ গো! তোমাদের কত ছেলে আজ তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার দেখ বাবা, একবার মুখ তুলে চাও মা!”

রমেশ গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, “বাবা বিশ্বনাথ, কোন দিন তোমায় ডাকিনি, কোন দিন তোমার নাম করিনি। আজ তুমি এ কি খেলা দেখালে বাবা! যারা কাশীর গুণ্ডা, যাদের দেখে সহরের লোক ভয় পায়, আজ তাদের দিয়ে এ কি খেলা খেল্‌ছ বাবা! বল, জয় বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়!”

সেই নৈশ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া, সেই নিস্তব্ধ পল্লী মুখর করিয়া, সেই গৃহ হইতে বজ্রগম্ভীর শব্দ উঠিল—

“জয় বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়!”

লক্ষ্মীও সকল শোক ভুলিয়া, তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল “জয় বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়।”

বাহির হইতে গাঁজাখোর সিধুও বলিয়া উঠিল “জয়, বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়, জয় মা অন্নপূর্ণাকি জয়!”

ধরাতলে স্বর্গ নামিয়া আসিল। এই সমবেত কাতর কণ্ঠের জয়ধ্বনি নিশ্চয়ই—আমি বলিতেছি নিশ্চয়ই—বাবা বিশ্বনাথের কর্ণে পৌঁছিল। তোমরাও সকলে বল—সকল কণ্ঠ এক করিয়া বল—সর্ব্ব-জাতি-নির্ব্বিশেষে বল—‘জয় বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়!” এই শ্মশান-যাত্রার পথে দাঁড়াইয়া একবার সেই বিশ্ববিজয়ী নাম কর,—সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে—জীবন ধন্য হইবে!

তাহার পর সকলে মিলিয়া, বাবা বিশ্বনাথের নাম করিতে-করিতে সেই দেব-দম্পতীকে মণিকর্ণিকায় লইয়া গেল। যথেষ্ট ধূপ, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ আনীত হইল। দুইটী দেহ একই চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে লক্ষ্মীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিল; তাহার পর সেই দেব-দেহে অগ্নি-সংযোগ করিল।

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব সেই দেব-দেবীকে প্রদক্ষিণ

করিয়া শিখা বিস্তার করিলেন। অত রাত্রিতেও অনেক লোক সংবাদ পাইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে আসিল,—ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দুই ঘণ্টা পরে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, সকলে ঘরে চলিয়া গেল। রমেশ লক্ষ্মীকে লইয়া শূন্য-গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সিধু বাড়ীতে প্রহরী ছিল। তাহারা এত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল দেখিয়া বলিল, "রমেশ দা, এত শীগ্‌গিরই সব শেষ হয়ে গেল।"

রমেশ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মী "বাবা গো—মা গো" বলিয়া প্রাঙ্গণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

১৬

রাত্রি তখন প্রায় একটা। রমেশ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, অনেক সান্ত্বনা দিয়া, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইল। লক্ষ্মী ঘরের এদিক ওদিক চায়, আর কাঁদিয়া উঠে।

রমেশ বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, এখন একটু ঘুমাও। সারাদিন মুখে জলটুকুও দেও নাই; তার পর এই শরীর; শেষে তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, এখন তাই যে আমি চাই। বাবা গেলেন, মা গেলেন; আমি বেঁচে থাক্‌লাম কেন? আমারই যে আগে যাওয়া দরকার ছিল রমেশ দা!"

রমেশ বলিল, "যে নিয়ে যাবার মালিক, সে ত দিদি, কারও দরকারের দিকে চায় না—তার মত সে নিয়ে যায়।"

লক্ষ্মী বলিল, "তুমি জান না রমেশ দা, আমার মরবার দরকার এত বেশী কেন?"

"সে আমার জেনে কাজ নেই দিদি! তুমি ঘুমোও।"

লক্ষ্মী বলিল, "না দাদা, আজ আর আমার ঘুম হবে না। তুমি আমার কথা কিছুই জান না; তাই আমাকে ঘুমুতে বল্‌ছ। আমার কি ঘুম আছে ভাই! তোমরা রাত্রে যখন মনে করেছ,

আমি ঘুমিয়েছি, আমি তখনও জেগে। এমনই করে আমার দিনরাত কেটে গেছে।"

রমেশ বলিল, "সে কথা এখন থাক্, তুমি শোও লক্ষ্মী দিদি আমার।"

লক্ষ্মী বলিল, "না রমেশ দা, আজ ত আমি শোব না। আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা শুন্‌তে হবে। শোন নি, মা মরবার আগে কতবার বলেছেন, আমি বড় হতভাগিনী। তাই অত করে তোমার হাতে আমাকে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি না শুন্‌লে আর কে আমার দুঃখের কথা শুন্‌বে?"

"আজ নয় দিদি, আর একদিন শুন্‌বো। আজ যে আমার কিছুই ভাল লাগছে না।"

"না দাদা, সে হবে না। এখনও গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখে এস, আমার মা-বাপের চিতা গরম রয়েছে; এখনই তোমাকে শুন্‌তে হবে। কে বল্‌তে পারে, আর যদি সময় না হয়।"

রমেশ বলিল, "তুমি কি পাগল হলে দিদি লক্ষ্মী! তোমার শরীর যে ভাল নয়; একটু চুপ করে শোও।"

লক্ষ্মী বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি রমেশ দা, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার কথা রাখ। আজই তোমাকে সব বলি। তা হলে আমার বুক একটু হাল্‌কা হবে দাদা!"

রমেশ বলিল, "নিতান্তই যদি তোমার জেদ হয়ে থাকে, বল; কিন্তু এখনও বল্‌ছি, এই অবস্থায় সারারাত জাগ্‌লে নিশ্চয়ই

তোমার অসুখ হবে। দেখ্‌ছ ত কাশীতে কি আরম্ভ হয়েছে; ঘরে-ঘরে সুধু কান্না।"

"আমার কান্নাও তাই শোন দাদা! আমি বড় দুঃখিনী!"

লক্ষ্মী তখন তাহার জীবন-কাহিনী আরম্ভ করিল। যখন সে পাষণ্ডদের কর্ত্তৃক তাহার অপহরণের কথা বলিতে লাগিল, তখন রমেশ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল; বলিল, "থাম দিদি, থাম; আর আমি শুন্‌তে চাইনে। কি ভয়ানক কথা।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, অত অধীর হোয়ো না; এখনই কি হয়েছে। এ ত সামান্য কথা। এর চাইতেও ভয়ানক কথা আছে।"

এই বলিয়া সে পরবর্ত্তী ঘটনা সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিল; একটী কথাও গোপন করিল না। যখন সে তাহার গর্ভের সন্তান নষ্ট করিবার আয়োজনের কথা বলিল, রমেশ তখন শিহরিয়া উঠিল; লক্ষ্মীর হাত দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, আর না—আর আমি শুন্‌তে পারব না—আর তোমায় বল্‌তে হবে না। আমিই তার পরের কথা বল্‌ছি শোন। তোমার সেই দয়াল কাকার পরামর্শ নিয়ে তোমার বাবা তোমাকে এখানে এনেছিলেন। তার পর কোন রকমে তোমার সন্তানটীকে নষ্ট—"

"না, না, রমেশ দা, তা তাঁদের আর অভিপ্রায় ছিল না; সে ইচ্ছা বাবা ত্যাগ করেছিলেন। আমার যা হয় দেখে, তার পর যে ব্যবস্থা হয়, তাই তাঁরা করতেন। মা আমাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারতেন না।"

"হয় ত এই করতেন, তোমাকে আর তোমার মাকে এখানে রেখে তিনি দেশে চলে যেতেন।"

"না, না, তাও বাবা করতে পারতেন না—তিনি আমাকে বড্ডই ভাল বাস্‌তেন রমেশ দা!"

"এই বুঝি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দিদি!"

"না রমেশ দা, অমন করে বাবার বিচার কোরো না। জান না, আমাদের সমাজ কি;—জান না তুমি, আমার বাবার দেশে কত বড় নাম;—জান না তুমি, তিনি কি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বাপ-পিতামহের নাম, তাঁদের সম্মান, পরিবারের জীবনোপায়—এ সব কি মানুষে সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারে? সংসারের থেকে কেউ পারে না রমেশ দা।"

রমেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, তার পর।"

"তার পর আমার আর কিছুই বল্‌বার নেই। আমি সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি আর কি বলব। মা যে তোমারই উপর সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছেন।"

"মা-ঠাকরুণ সতীলক্ষ্মী, তাই তিনি আমার উপর—এই সমাজ-ছাড়া মানুষের উপর ভার দিয়ে গেছেন;—তাই তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন। যাক্, তোমার কথা ত হয়েছে। এখন আমার কথা শোন। তোমার কোন ভয় নেই;—আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে তোমার একগাছি চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। রমেশ জানা তোমাদের সমাজ মানে না,—সমাজের ভয়ও করে না। তুমিও তা কর না। তা করলে

তুমি এমন সাহস করতে পারতে না; দশজনে যা করে, তুমিও তাই করতে। কিন্তু তুমি দশজনের অনেক উপরে। তুমি সত্যই লক্ষ্মী! তোমার সমাজ—তোমার আপনার জন তোমাকে যা মনে করতে হয় করুক, আমি তোমাকে কোলে তুলে নিচ্ছি। তোমার শাস্তরে কি বলে, তা আমি জানিনে, আর জান্‌তেও চাইনে; এই কাশীতে অনেক শাস্তর দেখলাম। তোমার শাস্তরের উপর, তোমার সমাজের উপর আমার কোন দিনই ভক্তি ছিল না—আজও হবে না। তুমি ঠিক বলেছ, তুমি সতী; তোমার কোন অপরাধ নেই—কোন অপরাধ নেই দিদি! যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, সে কে, তা তুমি জান না,—আর জেনেও কাজ নেই;—সে ত সেই রাত্রেই মরে গেছে।—তুমি ঠিক্ বলেছ—সে সেই রাত্রেতেই মারা গেছে। সেই দিন থেকেই তুমি বিধবা। কে তোমায় কি বল্‌তে পারে? আসুক ত সে! কেমন তার শাস্তর, কেমন তার সমাজ, আমি বুঝে নেব। শোন দিদি লক্ষ্মী, তুমি বিধবা, বিধবার মতই থাক্‌বে। আমি তোমাকে প্রতিপালন করব। তোমার যে সন্তান হবে—তাকে আমি মানুষ করব—সত্যি মানুষ করব। তার পর সে যাতে তোমাদের এই সমাজের ভয় না করে, তার মত তাকে শেখাব। তুমি কিছু ভেব না। আজ বুঝলাম, এই ভার বইবার জন্যই আমি এত দিন বেচে ছিলাম। দশ বছরের সময় মা আমাকে একেলা ফেলে যখন চলে গেল, তখন যে মরি নাই—সে এই কাজের জন্য; তার পর যে-ঘর সংসার করি নাই—সে ইচ্ছা যে হয় নাই

—সে এই কাজ করবার জন্য। তার পর, এই যে চিরকালটা স্ত্রীলোককে মা বোন ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখি নাই, কোন দিন যে কোন বদ্ চিন্তাও আমার মনে হয় নাই; সে আমার বাহাদুরী নয়,—তা আজ বুঝলাম। যে আমাকে এই কাজের ভার দিয়ে যাবে,—সেই তোমার মা-ই আমাকে এ কাজের মত, এ ভার বইবার মত শক্তি দিয়েছিলেন; তাই আমি আজ কোন ভয় না করে, দিদি লক্ষ্মী, তোমার ভার নিলাম। তোমার মা তাই জেনেই আমার হাতে তোমাকে দিয়েছেন। বেশ, তাই হবে। আজ থেকে রমেশ জানা এক নূতন সংসার পাতবে। সে সংসারে থাক্‌বে তার লক্ষ্মী দিদি, আর থাক্‌বে রমেশ—আর থাক্‌বে যে আসছে।”

লক্ষ্মী এতক্ষণ স্থির ভাবে রমেশের কথা শুনিতেছিল। এত দয়া, এত মমতা এই রমেশের! এত উচ্চ হৃদয় এই রমেশ দাদার! সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, “রমেশ দা, তুমি মানুষ, না দেবতা। এমন কথা ত আমার কাকার মুখেও শুনি নাই। আমার কাকাও তোমারই মত। তবে তিনিও যে সংসারী; তাঁকেও যে সব দিক চাইতে হয়—সমাজের মুখ চাইতে হয়। তা নইলে, তিনিও তোমারই মত। কিন্তু তাঁর ত উপায় ছিল না।”

রমেশ বলিল “তাঁর কথা যা তোমার কাছে শুন্‌লাম, তাতে তিনিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না—তাঁর যে সংসার আছে, সমাজ আছে। তাঁকে আর বিপদে ফেলে কাজ কি?

দেখ, তাঁকে তার করেছি ; তিনি খুব সম্ভব পরশু এসে পড়বেন। তার পূর্ব্বেই তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, লুকিয়ে যেতে হবে। তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? কা'লই তোমাকে আমি অন্য যায়গায় নিয়ে যাব ; কেউ সে সংবাদও জান্‌তে পারবে না। তারপর তোমার ভার আমার উপর। আমি যেমন করে হোক, তোমাকে প্রতিপালন করব।"

লক্ষ্মী বলিল, "সেই ভাল। তুমি তাই ঠিক কর। কিন্তু রমেশদা, কা'লই যে আমি যেতে পারছি নে। কাকা-কাকী দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আস্‌বেন। তাঁদের একবার না দেখে, জন্মের শোধ তাঁদের কাছে বিদায় না নিয়ে যে আমি যেতে পারব না। রমেশদা, কাকা যে আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন। তুমি বল্‌বে, তা হলে কি করে যাব। সে আমি পারব। কাকা যা করতে চাইবেন, তা আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি। তিনি বল্‌বেন, তিনি বাড়ী গিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আমাকে নিয়ে জীবন কাটাবেন ; আমার জন্য তিনি সব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবেন। আমার কাকীমাও তাই বল্‌বেন। সেই কথাগুলো একবার তাঁদের মুখে শুন্‌তে চাই—তোমাকেও শোনাতে চাই। তুমি দেখ্‌তে পাবে, তোমারই মত আর একজন আমার আছে।"

"তারপর কিং করে যাবে ?"

"যাব, নিশ্চয়ই যাব। যিনি আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবেন, পথের ভিখারী হতে চাইবেন, আমি কি তাঁকে তা

করতে দিতে পারি? কিছুতেই না রমেশ দাদা, কিছুতেই না। তবুও একবার তাঁদের না দেখে, তাঁদের মুখের কথা না শুনে যেতে পারব না। তাঁরা আসুন; এদিকে তুমিও একটা গোপন স্থান ঠিক কর। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে একদিন রাত্রিতে আমি পালিয়ে যাব। একখানা পত্রে সব কথা খুলে লিখে দিয়ে আমি জন্মের মত বিদায় হব। তারপর এই কাশীতে কি দুটো অন্ন মিল্‌বে না? তুমি আমাকে আশ্রয় দিও, রক্ষা কোরো; আমি কারও বাড়ীতে দাসীগিরি করে, রাঁধুনীর কাজ করে জীবন কাটাব।"

"সে সব কিছুই তোমাকে করতে হবে না দিদি লক্ষ্মী, তার ব্যবস্থা আমার উপর;—সে ভার মা-ঠাকরুণ আমাকে দিয়ে গেছেন, তোমাকে দেন নাই। এখন ত কথা শেষ হোলো; তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমোও ত দিদি! মনে কোন আক্ষেপ রেখো না; তোমার কোন অপরাধ নেই—তুমি আমার সতীলক্ষ্মী দিদি! কা'লই আমি সব ঠিক করে ফেলব। এই কাশী ছেড়ে যেতে পারব না। এখানেই তোমাকে আমি এমন করে লুকিয়ে রাখব যে, কেউ তোমার খোজ পাবে না।"

১৭

পরদিন লক্ষ্মী রমেশকে বলিল, "রমেশদা, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ ত দরকার। আমি সেটা করে ফেলি। তুমি সামান্য রকম উদ্যোগ করে দেও। পণ্ডিতেরা হয় ত বল্‌বে, আমার অধিকার নেই, আমি পতিতা। কিন্তু তুমিও তা স্বীকার করবে না, আমিও স্বীকার করি না। আমি মা-বাবার শ্রাদ্ধ করব। কোন রকমে কাজ শেষ করব। যা টাকা আছে, তা এই কাজেই ব্যয় করে, একেবারে খালি হাতে পথে গিয়ে দাঁড়াব।"

রমেশ লক্ষ্মীর কথামত আয়োজন করিল। অন্য কিছুই করা হইবে না, সুধু সে-দিনের শ্মশান-সঙ্গী কয়জনকে খাওয়ানো স্থির হইল। একজন পুরোহিতেরও ব্যবস্থা করা হইল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে রামার দল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল; কেহ বাজারে গেল, কেহ রান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রামা বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না; আমরা সব করে নেব।"

লক্ষ্মী বলিল, "তোমরা সেদিন আমার ভাইয়ের কাজ করেছ; আজও ভাইয়ের কাজ কর; আমি ত কিছুই জানিনে।"

"সে জন্য ব্যস্ত হতে হবে না; সব ঠিক হয়ে যাবে।"

উদ্যোগ-আয়োজন করিতে বেলা হইয়া গেল। পুরোহিত আসিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত দ্রব্য গোছাইয়া লইলেন। লক্ষ্মী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। রমেশ ও দুইতিনজন দুয়ারের কাছে গেল।

হরেকৃষ্ণ তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে কি রামকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে মহাশয় থাকেন?"

রমেশের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই লক্ষ্মীর কাকা হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি বাড়ীর মধ্যে যান। ওঁকে আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। ওরে রামা, জিনিস-গুলো নামাবার ব্যবস্থা কর্ ভাই!"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "দাদা কেমন আছেন?"

রমেশ বলিল, "বাড়ীর মধ্যে চলুন, সব——"

আর কথা বলিতে হইল না; লক্ষ্মী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া হরেকৃষ্ণের কোলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "কাকা গো, কেউ নেই কাকা! সব ভাসিয়ে দিয়েছি।"

হরেকৃষ্ণ এই হঠাৎ বজ্রপাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন,—একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

রমেশ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া গাড়ীর নিকট গেল; এবং ছোট বধূকে গাড়ী হইতে নামাইল। ছোট বধূও তখন আর

বাড়ীর মধ্যে যাইতে পারিলেন না ; লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

রামার দলের দুই তিনজন গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া গাড়োয়ানের ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

রমেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কাকা মশাই, আর কেঁদে কি করবেন, তাঁদের অদৃষ্টে কাশীপ্রাপ্তি ছিল, হরগৌরীর মত তাঁরা এক-সঙ্গে চলে গেছেন।"

হরেকৃষ্ণ অধীর ভাবে রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড়- বৌ!"

"তিনিও নেই ; দুই মিনিট আগে-পাছে দুইজনই গিয়েছেন।"

"ওরে লক্ষ্মী, তা হ'লে আমাদের কেউ নেই মা! দাদাও নেই, বড়-বৌও নেই। আমি কি দেখ্‌তে কাশী এলাম। দাদা গো—"

অনেক বলিয়া-কহিয়া শান্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল।

রমেশ বলিল, "আজ চারদিন ; তাই দিদি লক্ষ্মীকে দিয়ে চতুর্থীর কাজটা শেষ করাবার আয়োজন করেছি।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "তাই হোক।"

শ্রাদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রহিল। হরেকৃষ্ণ ও ছোট বধূকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিবার জন্য একজন তাঁহাদের সঙ্গে গেল। তাঁহারা স্নান শেষ করিয়া বাসায় আসিলেন।

হরেকৃষ্ণ বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দায় আসিয়া বলিলেন, "আর বিলম্বে কাজ নেই ; পুরোহিত মশাই, কার্য্য আরম্ভ করুন।"

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ওদিকে রামার দল রাঁন্নাঘরে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করিতেছিল। প্রায় তিনটার সময় ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেল। রামার দলের কুড়িজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। হরেকৃষ্ণ তাহাদের একটাকা করিয়া ভোজন-দক্ষিণা দিলেন। তাহারা মহা সন্তুষ্ট হইল। যাইবার সময় রামা বলিল, "দেখ রমেশদা, শোন দিদি-ঠাকরুণ, যখন যা দরকার হবে, কাকের মুখে একটু খবর দিলেই এই রামার দল এসে তা ক'রে দিয়ে যাবে—একটা মাত্র খবর।"

লক্ষ্মী বলিল, "তোমরা আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

তাহারা চলিয়া গেলে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কে?"

রমেশ বলিল, "কাকা মশাই, এরা এই কাশীর একটা বড় গুণ্ডার দল। এদের অসাধ্য কাজ নেই। আমার এরা বাধ্য। তাই সেদিন সেই বিপদের সময় এদের ডেকেছিলাম; এরাই সাহায্য করেছিল, তাই সেই রাত্রে শ্মশানের কাজ করতে পেরেছিলাম; নইলে এখন কাশীর যে অবস্থা, এরা না এলে কিছুই করতে পারতাম না। সে রাত্রে জনপ্রতি পাঁচ টাকা দিলেও বামুন পাওয়া যেত না। এরা তিন টাকায় স্বীকার করেছিল; শেষে কেউ টাকা নিল না; বল্‌ল, ঐ টাকা দিয়ে ঘি, চন্দনকাঠ কিনে আমরা এই শব দাহ করব। তাই করল। ওরা দিদি লক্ষ্মীর গুণে একেবারে জল হয়ে গিয়েছে।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "মা আমার এমনই বটে! গাঁ একেবারে আঁধার করে এসেছে। এখন সব কথা শুনি।"

রমেশ বলিল, "সে সব শুনবার সময় আছে। আপনারা একটু কিছু মুখে দেন।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, কাকা কাকীমা ত ও-সব কিছু খাবেন না; ওঁদের রান্নার আয়োজন করে দিতে হবে। তুমিও যে কিছু খাও নাই রমেশ দা!"

"আমার জন্য ভাবতে হবে না। এখনই ওঁদের আয়োজন করে দিচ্ছি।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "এখন আর নয়; একেবারে সন্ধ্যার পর যা হয় করা যাবে। রমেশ, তুমি দুটো খেয়ে নেও।"

"তা কি হয় কাকা মশাই! আপনাদের সেবা হ'লে আমি তবে প্রসাদ পাব।" এই বলিয়া রমেশ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

হরেকৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীর নিকট রমেশের কথা শুনিলেন, বড় কর্ত্তা ও বড় গিন্নীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ শুনিলেন।

লক্ষ্মী বলিল, "কাকা, রমেশ দা মানুষ নয়, দেবতা। সংসারে কেউ নেই; বিয়ে করে নাই। স্বভাব একেবারে নির্ম্মল। এমন মানুষ দেখি নাই। এই যে বুড়ো হয়েছে, একদিন কোন অন্যায় কাজ করে নাই, তামাক-পানটুকু পর্য্যন্ত কখন খায় নাই। রমেশ দা না থাক্‌লে আমাদের যে কি হোতো, তা ভাবলেও প্রাণ কেমন করে ওঠে।"

রমেশ এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও-সব কথা শুন্‌বেন

না কাকা মশাই! আমি অতি সামান্য মানুষ! এই দেখ দিদি লক্ষ্মী, তুমি যে সিধু সিধু করছিলে, তোমার সিধু এসেছে।"

সিধুকে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "সিধু, তোমার কথা কতবার বলেছি। রমেশ দাদা বল্‌ল, তাকে কি খুজে পাওয়া যায়, সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সিধু বলিল, "তা দিদি, ঘুরে ত বেড়াতেই হয়—ভিক্ষে ত চাই। গাঁজা সিদ্ধি খাই—ও একটা নেশা; ছাড়তে পারিনে; কিন্তু দেখ, এই মিষ্টি কথার নেশা ও-সব নেশার চাইতে বড়—একেবারে নেশার রাজা! তোমার কাছে মিষ্টি কথা পেয়েছি, দিন গেলে একবার সে নেশা না করলে কি চলে, কি বল রমেশ দা!"

লক্ষ্মী বলিল, "তা বেশ, তুমি একখানা পাতা নিয়ে বোসো সিধু! আমার কাকা এসেছেন, উনি তোমাকে পেট ভরে খাওয়াবেন। কাকা, সেই রাত্রে এই সিধু আমাদের এখানে পাহারা দিয়েছিল। সারা রাত বসে ছিল।"

সিধু বলিল, "সিধু ত প্রথমে গাঁজার লোভেই এসেছিল, বুঝলেন ঠাকুর মশাই; কিন্তু তারপর বল দেখি ঠাকরুণ, কিসের লোভে রোজ একবার করে আসি। ঐ যে বলেছি মিষ্টি কথার নেশায়। পয়সা সবাই দিতে পারে;—মিষ্টি কথা, বুঝলে, ওটা দেবার লোক বড় বেশী নেই।"

তাহার পর সিধুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া হরেকৃষ্ণ তাহাকে একটা টাকা দিলেন। সিধু বলিল, "টাকা কি হবে ঠাকুর মশাই, গাঁজার পয়সা আজ আছে।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "নিয়ে রাখ, তুমি আমাদের সেদিন কত উপকার করেছ।"

সিধু মহা আনন্দে চলিয়া গেল। তখন ছোট-বধূ লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, বাইরে যে কতকগুলো কাঙ্গাল-গরিব এসেছে, তাদের কি অমনি ফিরিয়ে দেবে। তা ত হবে না। আমার দিদি যে কাঙ্গালের মা ছিলেন।"

কথাটা রমেশের কাণে গেল; সে বলিল, "আমি আসা-মাত্রই মুখ দেখেই চিনেছি, এক কাঙ্গালের মা চলে গিয়েছেন, আর এক কাঙ্গালের মা এসেছেন। সেজন্য ভাবনা নেই; আমি এই এখনই দোকানে গিয়েছিলাম; বলে এসেছি, তারা এখনই চিড়ে-মুড়কী পাঠিয়ে দেবে। বাইরে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলেছি। চারটী করে ভুজা দেব, আর চারটী করে পয়সা দেব।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "উত্তম ব্যবস্থা করেছ"। তা হ'লে টাকা নিয়ে যাও।"

রমেশ বলিল, "টাকার দরকার নেই; আমার কাছে টাকা আছে, তাতেই হবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, তুমি ত সবে পঁচিশটী টাকা কা'ল নিয়েছ। তা দিয়ে কি এত হতে পারে—খরচ যে অনেক হয়ে গেল?"

রমেশ বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, তোমায় ত বলেছি, হিসেব

আমি কাউকে দেই নি, দেবও না। টাকা আছে, খরচ করছি, ব্যস্‌!"

লক্ষ্মী বলিল, "কাকা, বুঝেছ কথাটা। রমেশ দা, নিজের টাকা খরচ করছে।"

রমেশ বলিল, "শুনলেন কাকাবাবু, টাকা আবার কারো যেন নিজের হয়। টাকা কারো না; সে কারো ধার ধারে না,—টাকা টাকার। যাক্‌গে, এখন একটু বসি। এই চিড়ে-মুড়কীগুলো এলে ওদের বিদেয় করতে পারলেই হয়।"

কিছুক্ষণ পরেই কাঙ্গালী-বিদায় হইয়া গেল। প্রায় একশত কাঙ্গালী আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী ও ছোটবধূ পাক করিতে গেলেন। তখন হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "রমেশ, যা শুনলাম, তাতে ত তুমি আমাদের ছেলেরও বেশী। তোমার ধার আমরা জীবনেও শোধ করতে পারব না। তারপর, দাদা আর বড়-বৌ কেন এখানে এসেছিলেন, সে সবই তুমি শুনেছ, সবই তুমি জান। এখন কর্ত্তব্য কি?"

রমেশ বলিল, "আপনি কি ভেবেছেন, তাই বলুন।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি স্থির করলাম, তোমরা এখানে থাক, আমি একেলা একবার বাড়ী যাই। সেখানে যা কিছু আছে, বেচে-কিনে, শিষ্য যজমানদের কাছে চিরবিদায় নিয়ে আমি চলে আস্‌ব। তারপর যে কয়দিন বাঁচি, লক্ষ্মীকে বুকে করে কাশীতে কাটিয়ে দেব। দেশে আর যাব না;

সমাজের ধার আর ধারব না। কাঞ্চনপুরের বাঁড়ুয্যে বংশ লোপ পায়, পাবে; আমি পশুর মত কাজ করতে পারব না। তাই পারব না বলেই দাদাকে বড়বৌকে এখানে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা ত চলে গেলেন। এখন আমাকেও তাই করতে হবে। লক্ষ্মীকে আমি কিছুতেই ফেল্‌তে পারব না;—কোন মতেই নয়।"

"দিদিলক্ষ্মী কি এতে স্বীকার হবে।"

"তাকে ত জিজ্ঞাসা করতে যাব না। আমার যা কর্ত্তব্য, আমি তাই করব। দাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর আদেশ পালন করেছি; কিন্তু রমেশ, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাঁর আদেশও আমি মাথা পেতে নিতে পারিনি। আজ তিনি চলে গেছেন, বড়-বৌ চলে গেছেন। এখন আমার কি? আমি যা মনে করেছি, তাই করব! যে সমাজ ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়,—যে সমাজ পাপকে গোপন করে রেখে ধার্ম্মিক সেজে বেড়াতে চায়, সে সমাজ আর আমি চাইনে। বল ত—তুমিই বল, লক্ষ্মীর অপরাধ কি? কি অপরাধে তাকে দণ্ড দিতে যাব? সে আমার দ্বারা হবে না—আমি তা পারব না। তাতে সমাজ ছাড়তে হয়, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে হয়—এমন কি আমার স্ত্রীও যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চান, যাবেন;—আমি ঐ হতভাগিনীকে নিয়ে জীবন কাটাব। তাকে আমি ফেল্‌তে পারব না।"

রমেশ দুই হাতে হরেকৃষ্ণের পায়ের ধূলো লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "হাঁ, মানুষের মত কথা বটে!"

"তা হলে এই ঠিক রইল। দুই-একদিন পরেই আমি বাড়ী চলে যাব। তারপর সব ঠিকঠাক করে আস্‌তে আমার মাসখানেক-দেড়েক বিলম্ব হবে। সাতপুরুষের বাস—ভেঙ্গে আস্‌তে হবে; একটু দেরী হবেই। ততদিন তোমার উপর সব ভার। আমি টাকা রেখে যাব। এ বাড়ীতে যখন দাদা বড়-বৌ দুজনই মারা গেলেন, তখন, এখানে আর থেকে কাজ নেই। আর একটা ছোট দেখে বাড়ী ঠিক কর। সেখানেই উঠে যাব। দেখ, আমি সব বেচে-কিনে চার পাঁচ হাজার টাকার বেশীই নিয়ে আস্‌তে পারব। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

রমেশ এ প্রস্তাবের কোন উত্তরই করিল না। সে বলিল, "যাক্‌ ও-সব কথা এখন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি দেখিগে ওঁরা রান্নাঘরে কি করছেন।"

এই বলিয়া রমেশ উঠিয়া গেল। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে সে ত কিছুই বলিতে পারে না; সেই রাত্রিতেই ত লক্ষ্মীকে লইয়া সে পলায়ন করিবে; কাশীর এক দূর প্রান্তে সে ত বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছে; জিনিষ পত্রও সামান্য সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে। এ কয়দিন ত সে ঐ চেষ্টাতেই ফিরিয়াছে। আর হরেকৃষ্ণ যে এই কথা বলিবেন, তাহা লক্ষ্মী তাহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল। এ প্রস্তাবে লক্ষ্মী যে কিছুতেই সম্মত হইতে পারে না, তাহাও তাহারা স্থির করিয়াছিল। তাই রমেশ কোন মতই প্রকাশ করিল না।

আহারাদি শেষ হইতে একটু রাত্রি হইয়া গেল। হরেকৃষ্ণ

তিন দিনের পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার পর ঐই শোক। তিনি একটী ঘরে শয়ন করিলেন। ছোটবধূও ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তিনিও লক্ষ্মীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া দুই একটী কথা বলিতে-বলিতেই নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

লক্ষ্মীর চক্ষে নিদ্রা নাই। আজ যে সে এতদিনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোন্ এক অন্ধকার পথে বাহির হইবে;—তাহার কি নিদ্রা আসে। এই সতর বৎসরব্যাপী জীবনের ঘটনা আজ তাহার মানস-পটে উদিত হইতে লাগিল; তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে তখন যে কত কথা উঠিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

লক্ষ্মী যখন দেখিল যে, সকলেই নিদ্রিত হইয়াছেন, তখন সে প্রদীপের কাছে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতে লাগিল। পত্রখানি ছোট; কিন্তু তাহার যে কলম চলে না। এক-একবার চক্ষের জল মুছিয়া ফেলে, আবার এক লাইন লেখে;—আবার বসিয়া ভাবে; আবার কাঁদে;—আবার কলম তুলিয়া লইয়া লিখিতে বসে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি ধীরে ধীরে বিছানার উপর রাখিয়া দিল। তাহার পর নিদ্রিতা কাকীমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। আর যে সে স্নেহমাখা মুখ সে দেখিতে পাইবে না—আর যে 'কাকীমা' বলিয়া আদর করিয়া কাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে পারিবে না। আর একটু পরেই সব শেষ হইবে,—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া

যাইবে। লক্ষ্মী তখন একাকিনী হইবে। এই সংসারের সহিত তাহাকে একাকিনী যুদ্ধ করিতে হইবে। ভরসা ভগবান— ভরসা ঐ সর্ব্বনিয়ন্তা বাবা বিশ্বনাথ!

লক্ষ্মী আর অধিকক্ষণ ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিতে পারিল না, কি জানি যদি তাহার কাকী-মা হঠাৎ জাগিয়া উঠেন। তাঁহা হইলে ত তাহার আর যাওয়া হইবে না। সে তখন ধীরে-ধীরে বারান্দায় আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

রমেশও বাহিরে বসিয়াই আছে; তাহারও অপার ভাবনা। জীবনের এই শেষ ভাগে এ কি বিষম, কি গুরুতর দায়িত্ব সে মাথায় লইতেছে। একবার মনে হইতেছে, কাজ নেই, লক্ষ্মীকে নিবৃত্ত করি, এ অন্ধকারে পা ফেলিয়া কাজ নাই। পরক্ষণেই মনে হইতেছে, তাহার মা-ঠাকরুণের সেই অন্তিম অনুরোধ— তাঁহার মৃত্যুশয্যার কথা—প্রতিজ্ঞার কথা। শেষে তাহার প্রতিজ্ঞারই জয় হইল। সে মনে মনে বলিল, "যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে। লক্ষ্মীদিদিকে লইয়া আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। এতদিন পরের ভাবনা ভাবি নাই, নিজের ভাবনাও ভাবি নাই;—এখন একবার পরের ভাবনাই ভাবি। আর আমিই বা ভাবতে যাই কেন? আমি কে? আমি কি? কিছু না—কিছু না। ওরে 'আমি', তুই একটু সরে যা। তুই আমাকে এ কাজে বাধা দিবি; তুই সঙ্গে থাক্‌লে সব নষ্ট হবে। এস 'তুমি'—ওগো 'তুমি'—সব কাজ কর—লক্ষ্মীকে রক্ষা কর। লক্ষ্মীর ভার লও।"

এই সময় লক্ষ্মী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ উঠিয়া বলিল, "এসেছ দিদি লক্ষ্মী, চল। ঐ দেখ, বাবা বিশ্বনাথ পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। এই রমেশের মুখের দিকে চেয়ো না—চেয়ো না, তা হলে পড়ে যাবে,—এ পথে চল্‌তে পারবে না। চাও ঐ বিশ্বনাথের দিকে! চল, চল, দিদি, তিনি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।"

রমেশের কথা শুনিয়া লক্ষ্মীর শরীর রোমাঞ্চ হইল। সে বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সত্যই বিশ্বনাথ পথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আর ত দেরী করা চলে না।

সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "চল, রমেশ দাদা!" এই বলিয়াই একটু চুপ করিল। হায় অভাগিনী, এখনও মায়া —এখনও কাকা! লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, কাকাকে একবার দেখে যাব না —আমার কাকা—" কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

কক্ষের দ্বার একটু খোলা ছিল। লক্ষ্মী দ্বার আর একটু খুলিল। হরেকৃষ্ণ বোধ হয় তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; তিনি স্বপ্নঘোরেই বলিয়া উঠিলেন—

"লক্ষ্মী—মা আমার।"

লক্ষ্মীর আর পা চলিল না। এ কি মায়া! ওগো, এ কি খেলা!

লক্ষ্মী দুই-পা সরিয়া আসিয়া ভূমিতলে মস্তক ঠেকাইয়া বলিল, "কাকা যাই!"

তাহার পরই কোন দিকে না চাহিয়া, রমেশকেও না ডাকিয়া এক বস্ত্রে বিনা সম্বলে, পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমেশও প্রস্তুত ছিল। সে নিকটে আসিলে লক্ষ্মী বলিল, "চল রমেশ দা, জোরে চল—জোরে—জোরে" বলিয়া অগ্রসর হইল।

রমেশ কিছুদূর পিছনে পিছনে যাইয়া বলিল "দিদিলক্ষ্মী, বড় রাস্তায় গেলে চল্‌বে না। গলি দিয়ে যেতে হবে। এত রাত্রিতে বড় রাস্তায় পাহারাওয়ালা, পুলিশের লোক থাকে। এই পথে এস।" বলিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর এগলি-ওগলি দিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া, একটা অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিল। একটু যাইয়াই একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল; কোঁচার খুট হইতে চাবি লইয়া সেই বাড়ীর দ্বারের তালা খুলিল।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; রমেশ বলিল, "একটু দাঁড়াও দিদি লক্ষ্মী, আলোটা জ্বালি। সব ঠিক আছে। অন্ধকারে অজানা বাড়ীতে যেতে পারবে না।" এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই আলো জ্বালিল এবং পথ দেখাইয়া একটা ছোট সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া উঠিল।

বাড়ীটা অতি ছোট। উপরে একটী ঘর ও একটী বারান্দা; নীচে দুইটী ঘর; সম্মুখে ছোট একটী উঠান; তাহারই পার্শ্বে রান্নাঘর ও একদিকে পাইখানা। বাড়ীটা একেবারে নূতন।

লক্ষ্মীকে উপরে লইয়া গিয়া, ঘরটী খুলিয়া দিল। লক্ষ্মী ঘরের মেজেয় বসিয়া কাঁদিয়া উঠিল "বাবা গো—ও মা—কাকাগো।"

* * * *

প্রাতঃকালে হরেকৃষ্ণের প্রথমে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখেন, দ্বার খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় আসিয়া দেখেন, রমেশ নাই। মনে করিলেন, রমেশ উঠিয়া কোথাও গিয়াছে। তখন ধীরে-ধীরে পাশের ঘরের দিকে গেলেন; দেখেন সে ঘরও খোলা। দ্বারের নিকট হইতে ডাকিলেন "লক্ষ্মী!"

শব্দ শুনিয়াই ছোটবধূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "লক্ষ্মী কৈ?"

ছোট-বধূ বলিলেন, "বোধ হয় বাইরে গেছে। তাই ত সকাল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী যে বলেছিল, রাত থাকতে উঠে, আমাকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাবে।" এই বলিয়া খাটের উপর হইতে নামিতে গিয়াই দেখেন, বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে।

ছোট বধূ বলিলেন, "বিছানার উপর কার এ চিঠি!" এই বলিয়া চিঠিখানি তুলিয়া দেখিয়াই বলিলেন, "ওগো, এ যে তোমার নামে চিঠি, হাতের লেখা যে লক্ষ্মীর!" বলিয়াই তিনি বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন।

"আমার নামের চিঠি! লক্ষ্মীর হাতের লেখা!" বল কি?" বলিয়াই হরেকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঘরে তখনও সামান্য অন্ধকার ছিল। তিনি চিঠিখানি লইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটু পড়িয়াই বসিয়া পড়িলেন; আর পড়া হইল না; চীৎকার করিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশ হয়েছে, লক্ষ্মী চলে গিয়েছে। লক্ষ্মী, মা, লক্ষ্মী আমার।"

ছোট-বধূ তখন দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন। চিঠিখানি এই——

শ্রীচরণকমলেষু,

কাকা, আমি জন্মের মত চলিলাম। বাবা মা যে দিন মারা যান, সেইদিনই যাইতাম। যাইতে পারি নাই; জানিতাম তোমরা আসিবে। তোমাদের একবার না দেখিয়া, তোমাদের মুখে মা লক্ষ্মী ডাক না শুনিয়া যাইতে পারি নাই। তোমাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। এখন চলিলাম। তুমি আমার জন্য সব ছাড়িতে পার, তাহা আমি জানি। কিন্তু, তাহা হইতে পারে না; বাপ-পিতামহের নাম তুমি ডুবাইতে পারিবে না, বংশলোপ করিতে পাইবে না। তাহা আমি করিতে দিব না। তাই চলিলাম। আমার অনুসন্ধান করিও না, খুঁজিয়া পাইবে না। স্থির জানিও, তোমার ভাইঝি কুপথে যাইবে না। সে প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। দেবতার মত রমেশদা তাহার সহায় থাকিবে। তোমরা বাড়ী যাও। বাবা মার মৃত্যু-সংবাদ সত্য সংবাদ। সেই সঙ্গে সমাজের দিকে চাহিয়া একটা মিথ্যা সংবাদও প্রচার করিও,—লক্ষ্মীও মারা গিয়াছে। কত জন কত করে, তুমি এইটুকু মিথ্যা বলিও। তোমাদের কাছে আজ হইতে আমি মৃত, এ কথা ঠিক। কাকীমাকে আমার প্রণাম দিও। আর একটা অনুরোধ কাকা! অভাগিনী কন্যার কথা এক-একবার মনে করিও। আর আশীর্ব্বাদ করিও, আমি যেন

শীঘ্র মরি। কাকা, তোমার কথার অবাধ্য হইলাম। কিন্তু আর কোন উপায় বা পথ দেখিলাম না।

লক্ষ্মী।

কে শুনিবে তাঁহাদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন! কেহ নাই—কেহ নাই!

এই অপরিচিত সহরে কোথায় তাঁহারা লক্ষ্মীর অনুসন্ধান করিবেন? তবুও দুইতিনদিন নানা স্থানে ঘুরিলেন। সত্যবাবুর যে সরকারটী কাশীতে ছিল, সেও কয়েক দিন অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ফলই হইল না। সরকার তাঁহাদিগকে বলিল "কোন ভয় করবেন না। রমেশ খাঁটি মানুষ। অমন মানুষ হয় না। তার দ্বারা আপনাদের মেয়ের কোন অনিষ্ট হবে না, এ কথা আমি খুব বল্‌তে পারি। আপনাদের ঠিকানা আমাকে দিয়ে আপনারা দেশে যান। যখনই কোন সংবাদ পাব, তখনই আপনাকে জানাব।"

হরেকৃষ্ণ আর কি করিবেন। তিন চারি দিন বৃথা অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে বাড়ী-ভাড়া মিটাইয়া দিয়া এবং সরকারের হাতে ধরিয়া, সংবাদ দিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া, সোণার কমল কাশীর জন-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

১৮

রমেশ প্রথম দুই তিন দিন দিবাভাগে বাহির হইত না, কি জানি রাস্তায় যদি হরেকৃষ্ণের সহিত দেখা হয়। তাহার পর সে কোন প্রকারে সংবাদ পাইল যে, হরেকৃষ্ণ দেশে চলিয়া গিয়াছেন; তখন সে হাট-বাজার করিবার জন্য দিনেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল।

এ কয়দিনে সে একটী কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে দেখিল, এখন একাকিনী অবস্থায় লক্ষ্মীকে রাখা সঙ্গত নহে; ইহা যে তাহার পক্ষে নির্জ্জন কারাবাস হইল। এ ভাবে বাস করিলে তাহার শরীর মন দুই-ই অল্পদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাহার পর, যখন তাহার প্রসবের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই বা সে কি করিবে? কে তাহার সেবা করিবে, কে পথ্য দিবে? পূর্ব্বে এ সকল কথা তাহার মনে উঠে নাই; এখন এই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল।

সে বেশ বুঝিল, লক্ষ্মীর সঙ্গিনী দরকার। গৃহের সামান্য কাজকর্ম্মে আর কতটুকু সময় লাগে? অবশিষ্ট সময় তাহার মত নিরক্ষর বৃদ্ধের সঙ্গে এমন কি কথায় সে কাটাইতে পারে? তাহার শরীর না হয় এখন ভাল আছে; কিন্তু, বিশ্বনাথ না করুন, যদি সে দুইদিন অসুস্থ হয়, তখন তাহার ভাত-জল

কে দিবে? ব্রাহ্মণ-কন্যা ত তাহার রান্না কোন দ্রব্য খাইতে পারে না; আর সে-ই বা এমন কাজ করিবে কেন?

কিন্তু সে বিশ্বাস করিয়া ভার দিতে পারে, এমন স্ত্রীলোক ত অনেক চিন্তা করিয়াও খুঁজিয়া পাইল না। কাশীর মত স্থানে কত জন যে কত ভেক ধরিয়া আছে, তাহা ত তাহার অগোচর নাই। চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক ঠেকিয়াছে, অনেক শিখিয়াছে। যাহাকে ছয় মাস দেখিল বেশ শুদ্ধ, শান্ত, বেশ ধর্ম্মপরায়ণ; তাহার পরই তাহার কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী, কত নরহন্তা যে, এখানে সাধু-সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা ত সে জানে। এই কাশীতে সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না,—রমেশ ঠেকিয়া শিখিয়া এ কথা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছে। এ অবস্থায় সে কি করিবে? অথচ শীঘ্রই কিছু করা দরকার।

হঠাৎ একজনের কথা তাহার মনে হইল। বিগত দশ বৎসর সে এক ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া আসিতেছে; যখন-তখন অবসর সময়ে সে এই ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে যাইত। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দেখে নাই; কিন্তু তবুও সে তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে একটা উচ্চ ধারণা করিতে পারে নাই। হাঁ, তবে ব্রহ্মচারিণী ভাল বটে,—এইমাত্র ভাব তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিণী এই দশ বৎসর কাশীতে আছেন। দুর্গাবাটীর

অদূরবর্ত্তী একটী দেবতা-পরিত্যক্ত মন্দিরে তিনি বাস করেন; সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেহ নাই। এত দিনের মধ্যে কাহাকেও চেলা করেন নাই, বা কোন প্রকার আড়ম্বরও করেন নাই। একাকিনী থাকেন; যে যাহা দিয়া যায়, তাহাই আহার করেন। যে দিন কিছু না জোটে, উপবাস করেন। কোন দিন ভিক্ষায় বাহির হন না। ঠাকুর-দেবতা দর্শন করিতেও কখন যান না। অতি প্রত্যূষে একবার গঙ্গাস্নান করিতে যান; সূর্য্যের অভ্যুদয় কালেই ফিরিয়া আসেন। সকলেই বলে ব্রহ্মচারিণী খাঁটি মানুষ। কতজন তাঁহার শিষ্য-শিষ্যা হইতে চেষ্টা করিয়াছে; তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; কতজন তাঁহার আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে; তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলে, মধ্যে-মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঐ মন্দিরে আসেন; দুই চারি ঘণ্টা ব্রহ্মচারিণীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া যান। রমেশও এ সকল দেখিয়াছে। তবে তাহার কঠোর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় নাই। সে যাইত আসিত; ব্রহ্মচারিণী তাহার সহিত দুই চারিটী কথাও বলিতেন,—ভাল কথাই বলিতেন।

এতদিন রমেশের কোন প্রয়োজন হয় নাই; তাই সে ব্রহ্মচারিণীকে কোন কথা বলে নাই, কোন উপদেশও প্রার্থনা করে নাই;—ও সব তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মেয়েটীর ভার লইয়া সে যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে! তাই এই

ব্রহ্মচারিণীর কথা তাহার মনে হইল। সে মনে মনে বলিল, "দেখি না, ইনি কি বলেন। পরামর্শ জিজ্ঞাসায় ক্ষতি কি। মনের মত হয়, বিশ্বাস হয়, গ্রহণ করিব; না হয়, চলিয়া আসিব।"

এই ভাবিয়া একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে লক্ষ্মীকে বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, আমি একটা কাজের জন্য একটু বাইরে যাব। দেরী হবে না, এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্‌ব। তুমি বাইরের দুয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে যাও ত।"

রমেশ সকালে ও বিকালে বাজার করিতে যাওয়া ব্যতীত এ কয়দিন আর বাহিরে যায় নাই; আজ এই অসময়ে তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, তুমি বুঝি টাকা আন্‌তে যাচ্ছ? দেখ, আমার একটা ভাবনা হয়েছে। তুমি এই যে খরচ করছ, তারপর? যখন তোমার টাকা ফুরিয়ে যাবে, তখন কি হবে?"

রমেশ বলিল, "তার অনেক দেরী আছে। এতদিনের মধ্যে যা হয় একটা হয়ে যাবে। আমিই কি আর বসে থাকব। এই কটা মাস যাক্ না। তারপর কি করব জান? এ বাড়ী ছেড়ে দেব। সদর রাস্তায় একটা ছোট বাড়ী নেব। তার বাইরের দিকের ঘরে একটা দোকান করব। সেই দোকান থেকে যা লাভ হবে, তাইতে আমাদের বেশ চলে যাবে; সে সব আমি ভেবে-চিন্তে রেখেছি। কয়টা মাস কোন রকমে কাটাতে পারলেই হয়। টাকার কথা বল্‌ছিলে দিদি লক্ষ্মী!

না, টাকার এখন দরকার নেই। কুঠী থেকে যা এনেছি, তাতে বাড়ী-ভাড়া দিয়েও দুতিন মাস চলে যাবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, আমার জন্য তুমি তোমার এই এত কষ্টে জমান টাকা খরচ করছ; আমি ত কোন দিন এর একটা পয়সাও শোধ করতে পারব না—আমার কোনই উপায় নাই।"

"কে তোমাকে শোধ করতে বল্‌ছে দিদি লক্ষ্মী! কার জমান টাকা? টাকা বুঝি এতকাল আমি জমিয়ে রেখেছি। তুমি এত শাস্তর পড়েছ, এত তোমার বুদ্ধি; তুমি এই কথাটা বুঝতে পার না, এতেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমার ঘর নেই, সংসার নেই; আপনার বল্‌তে কেউ নেই;—আমি টাকা জমাতে যাব কেন? কার জন্যে? কথাটা কি জান দিদি! ছেলে মাটীতে পড়বার আগে তার আহারের জন্য মায়ের বুকের রক্ত ক্ষীর করে রাখে কে জান? পাহাড়ের পাষাণ ভেঙ্গে গঙ্গা বইয়ে দেছেন কে জান? যিনি এই সব খেলা দিন-রাত খেল্‌ছেন, তিনি সব দেখেন, সব জানেন! তুমি এমনই করে আস্‌বে জেনে তিনি এই আমার হাত দিয়ে টাকা জমিয়ে রাখছিলেন। আমিই কি তা জান্‌তাম, না বুঝতাম। এখন দেখ্‌ছি, আর অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। এ তোর টাকা দিদি! সব তোর;—তোরই জন্য এ টাকা কুঠীতে জমা হয়ে আস্‌ছিল। এখন খরচ হচ্ছে। এর একটী পয়সাও তোর রমেশ দাদার নয়। ভারি ত রমেশ দাদা! লেখা জানে না, পড়া জানে না;—

সে তোর ভার নেবে! তার সাধ্য কি! যাক্, ও সব কিছু ভেব না; এখন দোরটা বন্ধ করে দেও; আমি একটু ঘুরে আসি।" এই বলিয়া রমেশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল; এবং যখন দেখিল, দ্বার বন্ধ হইল, তখন দুর্গাবাড়ীর দিকে চলিল।

ব্রহ্মচারিণী যে মন্দিরে বাস করেন, তাহার নিকটে যাইতেই রমেশ দেখিল, মন্দিরের বাহিরে অপ্রশস্ত চাতালে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিণী বসিয়া আছেন। রমেশ মনে করিল, এ সময় যাইয়া কাজ নাই, ফিরিয়া যাই; আর এক সময় আসিব। পরক্ষণেই মনে করিল, না, যখন আসিয়াছি, তখন আর ফিরিব না; দেখা করিয়াই যাই।

রমেশ ধীরে-ধীরে সেই চাতালের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; —সে এতকাল কাহাকেও প্রণাম করে নাই,—ঠাকুর-দেবতাকেও না, মানুষকে ত নয়-ই। সে প্রণাম করিল না।

সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণীকে বলিতেছেন— "দেখ মা, সেবাধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম। তোমাকে যে এই দ্বাদশ বৎসর এত শিক্ষা দিলাম, তা এই সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য। তাই আজ এসেছি,—সে সুযোগও উপস্থিত।"

ব্রহ্মচারিণীর দৃষ্টি এইবার রমেশের দিকে পড়িল। তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, "রমেশ, অনেকদিন তুমি এ দিকে এসনি।"

রমেশ বলিল, "অনেকদিনই আস্তে পারি নি। আজ একটু বিপদে পড়েই এসেছি।"

ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া বলিলেন, "বিপদ! তোমার বিপদ! তুমি যে মুক্ত পুরুষ।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সহাস্যমুখে বলিলেন, "মুক্ত পুরুষকেও মাঝেমাঝে বন্ধনে পড়তে হয় মা! তুমিও মুক্ত, কিন্তু তোমার জন্যও বন্ধন তৈরী হয়েছে; এখনই জান্‌তে পারবে।"

ব্রহ্মচারিণী রমেশকে বলিলেন, "কি বিপদ তোমার রমেশ! ইনি আমার গুরুদেব।"

রমেশ বলিল, "তা আমি জানি। সে ভালই হোল, গুরু শিষ্যা দুইজনের কাছেই এক সঙ্গে কথাটা জানান হবে।" এই বলিয়া রমেশ সেই চাতালের সিঁড়িতে বসিয়া লক্ষ্মীর কথা আদ্যোপান্ত বলিল। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিণী তন্ময় ভাবে এই কাহিনী শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; কথার মধ্যে বাধা দিয়া কোন কথাই বলিলেন না।

রমেশের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "মা, সেবাধর্ম্মের কথা, আর তার সুযোগের কথা এইমাত্র তোমাকে বল্‌ছিলাম। এই দেখ সুযোগ উপস্থিত। এই সেবায় তোমাকে দীক্ষিত করবার জন্যই আমি আজ এসেছি।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "আমাকে এখন কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই মেয়েটীর ভার তোমাকে নিতে হবে। যাতে তার মঙ্গল হয়, তার ভার তোমার উপর রইল। আর তুমি যাকে মুক্ত পুরুষ বল্‌ছ, সে তোমার সহকারী হবে।

দেখ, এই মেয়েটীর একটী কন্যা-সন্তান হবে; তার লালন-পালন, শিক্ষাবিধানের ভার তোমাকে নিতে হবে। আর এই যে লক্ষ্মীর নাম শুন্‌লে, সেই লক্ষ্মীকে সর্ব্বপ্রকারে লক্ষ্মী করে তুল্‌বার কাজও তোমার উপর রইল। জিনিষ খাঁঠি, তোমরা দুটী কারিগরও ওস্তাদ! দুইজনই মুক্ত। এখন কিছুদিন এই ব্রত তোমাদের নিতে হবে; সাধন-ভজন, জপ-তপ—সর্ব্বত্র এর বাড়া আর ধর্ম্ম নেই মা। তোমার যথেষ্ঠ অর্থ আছে। এই দ্বাদশ বৎসর তার একটী পয়সাও তোমাকে স্পর্শ করতে দিই নাই;—তোমাকে কঠোর করতে শিখিয়েছি। এখন যাও, সেই অর্থের সদ্ব্যবহার কর। এ মন্দির ত্যাগ কর। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি জয়যুক্ত হবে। তোমাকেও আশীর্ব্বাদ করছি রমেশ, তোমারও জয় হোক। আমি সর্ব্বদা আস্‌ব, তোমাদের খোঁজ নেব। যখন যেমন করতে হবে, বলে যাব। দ্বাদশ বৎসর এই ব্রত পালন করতে হবে—একাগ্রচিত্তে পালন করতে হবে! তারপর যা ব্যবস্থা, দ্বাদশ বৎসর পরে আমি তা করব।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রহ্মচারিণী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—আজ ত আর তিনি ব্রহ্মচারিণী নহেন। রমেশের উন্নত মস্তক আজ নত হইল; সেও প্রথমে সন্ন্যাসী, তাহার পর এই দেবীকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় কথাটীও না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

১৯

দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাশীর কেশীঘাটের উপর একখানি নাতিবৃহৎ ভবনের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে অজিনাসনে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট; পার্শ্বে ধরাসনে দুইটী ব্রহ্মচারিণী;—দুইটীই মাতৃমূর্ত্তি; দুইজনকেই দেখিলে জগদ্ধাত্রী বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী বয়োধিকা ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "মা সরস্বতী, তোমার দ্বাদশ-বৎসরব্যাপী সেবার ফল হইয়াছে।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ফলের প্রত্যাশা ত করি নাই প্রভু! আপনি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রাণপণে একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সেই কাজের ফলেই আজ সমস্ত কাশী—আর কাশীই বা বলি কেন—সমস্ত ভারতে লক্ষ্মীর নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। মা লক্ষ্মী, আমি এই দ্বাদশ বৎসর তোমার জীবন-গঠনে সহায়তা করিয়াছি মা! বল, আজ তুমি কি চাও?"

লক্ষ্মী বলিলেন, "কোন দিন কিছু চাই নাই; চাহিবার ত কোন অবকাশ দেন নাই প্রভু! তবে আজ একটা প্রার্থনা আছে;—আমাকে অব্যাহতি দিন—আমাকে অন্তর্হিত হইতে দিন। চারিদিকের এ কোলাহল হইতে আমাকে দূরে অপসৃত করুন।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা! তোমাকে আমি জানি। এই যে তোমার নাম, তোমার যশঃ, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের বিপুল কাহিনী দেশে-দেশে প্রচারিত হইয়াছে ; তোমার জন-সেবা দর্শনে লোকে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে তোমার নাম স্মরণ করিতেছে ; কাশীর লক্ষ্মী-আশ্রম তোমার নাম ঘোষণা করিতেছে ; ইহাই তোমার পরীক্ষা! কেহ নির্জ্জনে পরীক্ষা দেয়, কাহাকেও বা জনসমারোহের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়। তুমি শেষোক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। এখন তুমি কি করিতে চাও, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য।"

লক্ষ্মী বলিল, "তাহা ত আমি জানি না প্রভু! সে কথা ত কোন দিন ভাবি নাই,—সে চিন্তা ত কোন দিন আমার মনে উঠিবার অবকাশ পায় নাই।"

"তোমার কন্যার কথা কিছু ভাবিয়াছ ?"

"আমার কন্যা! না প্রভু, কন্যা ত আমার নয়। আমি যে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাহার কথা ত ভাবি নাই—একদিনের জন্যও ভাবি নাই। সে ভার ত প্রভু আমার উপর দেন নাই। প্রথম যখন আপনি আমাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন ; দেবীর উপর, আর রমেশ দাদার উপর সে ভার দিলেন, তখন এক-একবার মন কেমন হইত, এ কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব। কিন্তু দেখিলাম, এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, নতুবা আপনার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। তাহার পর

হইতে আর সে চিন্তা আমি মনে স্থান দিই নাই,—স্থান দিলে আপনার সেবার অধিকার লাভ করিতে পারিতাম না—নর-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতাম না।”

' সরস্বতী বলিলেন, “দিদি লক্ষ্মী, আজ বার বৎসর তোমার ধন রক্ষা করিলাম, গুরুদেবের আদেশ-মত তাহাকে লালন-পালন করিলাম। এখন তাহাকে তুমি বুঝিয়া লও। আমাদের ছুটী।”

রমেশও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; সেও বলিল, “এ বুড়াকেও আর কেন! ঢের শিক্ষা দিলে দিদি! এখন

ভালয় ভালয় ছেড়ে দেগো,
আলোয় আলোয় চলে যাই।”

লক্ষ্মী বলিল, “দিদি, কে কার ছুটীর মালিক! ছুটী যে আমি অনেক দিন নিয়েছি। আমার ধন কৈ? সবই যে তোমার, আর ঐ রমেশ দাদার। আমি যে মৃত্যু-শয্যায় পড়ে ঈশানীকে বাবা বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করেছিলাম। তারপর তিনি যাদের দান করেছেন, ধন তাঁদের। ও ধনের কাজ আমার নেই—গুরুদেবের কৃপায় আমি অমূল্য ধনের সন্ধান পেয়েছি। আর আমাকে ভুলাতে পারবে না রমেশ দা!”

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমরা সকলেই দেখ্‌ছি ছুটী চাও। আমার ছুটীর যে অনেক বাকী মা, আমাকে যে এখনও অনেক ছুটাছুটী করতে হবে। শোন মা লক্ষ্মী, ঈশানীকে মনের মত করে গড়বার জন্য যা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, মা সরস্বতী আর রমেশ তা

করেছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যার যা যা শেখা উচিত, তাকে তা শেখান হয়েছে ;—সে যাতে লক্ষ্মীর মেয়ে—”

লক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিল, “না প্রভু, সরস্বতীর মেয়ে—”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তাই। সে যাতে সরস্বতীর মেয়ে হতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে ; সে চেষ্টা সফলও হয়েছে! কিন্তু একটা কাজ যে এখনও বাকী আছে। তবে সে দিকেও আমার চেষ্টার ক্রুটী হয় নাই। ঈশানীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করতে পারলেই, মা সরস্বতী, বাবা রমেশ, তোমাদের কার্য্য শেষ হয়। তারপর ত তোমাদের তিনজনের ছুটী। দেখ, ছেলে আমি পেয়েছি। আজ পাই নাই—ছয় বৎসর আগেই পেয়েছি। এই ছয় বৎসর আমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছি। বুঝেছ মা সরস্বতী, কে সেই ছেলে। তুমি ত জান, আমার শিষ্য ভুবনের ছেলে যাতে লেখাপড়া শেখে, জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হয়ে ঈশানীর উপযুক্ত হয়,তার জন্য আমি কত সময় দিয়েছি। ঈশানীর লেখাপড়া, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শিখাবার ভার তোমাদের উপর দিয়েছিলাম ; আর ভুবনের ছেলের শিক্ষার ভার আমি নিয়েছিলাম। তুমি ত জান মা, কতদিন বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে এই বাড়ীতে এসেছি ; ঈশানীর সঙ্গে তার লেখাপড়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করবার অবকাশ দিয়েছি। বিশ্বনাথ এইবার কাশী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে—উত্তীর্ণ নিশ্চয়ই হবে। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সে এখন আদর্শ-স্থানীয় ,—কি লেখাপড়ায়, কি ধর্ম্মভাবে, কি বিনয়-নম্রতায়, কি পরোপকারে, বিশ্বনাথ বিশ্বনাথেরই দাস।

ভুবন ছেলের বিবাহের ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। এইবার মা, আমাকে ঘটকালি করতে হবে ;—তোরা আমাকে দিয়ে কি না করিয়ে নিলি, বল্ দেখি।”

লক্ষ্মী একটু বিমর্ষভাবে বলিল, “তা কি পারবেন প্রভু! অজ্ঞাতকুলশীল—”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “কি বল্‌ছ মা! অজ্ঞাতকুলশীল বলে ভুবন আপত্তি করবে ?”

লক্ষ্মী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, “তিনি আপত্তি না করতে পারেন—তাঁর গুরু-আজ্ঞা। কিন্তু সমাজ—”

সন্ন্যাসী গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—“কি বল্‌ছ মা, সমাজ ? কোন্ সমাজ ? তোমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজ ? সে সমাজ মরতে বসেছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না মা, সে সমাজ এখন শ্মশান-শয্যায়। যে সমাজে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচারের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হচ্ছে ; যে সমাজে ধর্ম্মপ্রাণ বীরের অভাব হয়ে পড়েছে ; যে সমাজে কপটতা ধর্ম্মের আসন কলুষিত করছে,—সেই অধঃপতিত, মৃত্যু-মুখ সমাজের কথা বল্‌ছ ? সে সমাজকে ভয় করতে হবে না—তার অন্তিম শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। তুমি জান না মা, তুমি দেখ্‌তে পাও নাই ; আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—নব ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হচ্ছে। সে সমাজে সুস্থ, সবল, প্রাণবান্, ধর্ম্মপ্রাণ, কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীরের আবির্ভাব হয়েছে। তোমার সে জীর্ণ, পুতিগন্ধময় সমাজ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে ; আর তার স্থানে এই নব-বলদৃপ্ত, সদাচার-সম্পন্ন নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজের অভ্যুত্থান হচ্ছে। এই

সমাজই ভবিষ্যতে—অদূর ভবিষ্যতে পুণ্যভূমি ভারতে ব্রহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তার সূচনা হয়েছে,—তার বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠেছে; প্রাচ্য-প্রতীচ্যে তার সাড়া পড়ে গিয়েছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি আমি সেই সমাজ-গঠনে নিযুক্ত করেছি,—তোমাদের মাতৃশক্তি সেই সমাজের ভিত্তি প্রোথিত করছে। সেই সমাজের কথা বল। হিন্দু-সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে—পুরাতন দুর্গন্ধময় আচার-অনুষ্ঠান আর চল্‌বে না—চল্‌ছে না;—মুনিঋষি-গণের সেই সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এখন তাহারই জয়গান কর;—পুরাতনের কথা ভুলিয়া যাও,—নব-জীবনকে সানন্দে অভ্যর্থনা কর। সেই সমাজে তোমার ন্যায় সাধ্বী সতীর কন্যা, তোমার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী, মহিয়সী মহিলার দুহিতা স্থান প্রাপ্ত হবে। ইহাই বিশ্বনাথের আদেশ! সেই আদেশই আমরা প্রতিপালন করব—আর কোন আদেশ আমরা মানি না।"

লক্ষ্মী বিনীতভাবে বলিল, "একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কি?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না; তোমার মনের কথা বুঝেছি। তুমি বল্‌তে চাচ্ছ যে, তোমার কোনদিন যথা-শাস্ত্র বিবাহ হয় নাই; যে পাষণ্ড তোমার উপর অত্যাচার করেছিল, তাকে তুমি চিন্‌তে পার নাই; সুতরাং তোমার মেয়েকে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। কেমন, এই ত তোমার কথা।"

লক্ষ্মী বলিল, "বিবাহ করিতে পারে না, বা করা উচিত নয়, একথা আমি বল্‌ছিনে ; কিন্তু যে হিন্দু-সমাজ এখন বর্ত্তমান, সে সমাজ কি অসঙ্কুচিত চিত্তে এ বিবাহের অনুমোদন করতে পারবে ? এই আমার কথা।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ত সে কথার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়েছি। ভারতবর্ষে নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হতে আরম্ভ করেছে। সে সমাজ ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ;—সে সমাজ দেশাচারকে ডরায় না, ডরাবেও না। আচ্ছা, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপরাধ কি ? কি অপরাধে সমাজ তোমাকে ঠেলে ফেল্‌তে পারে ? তুমি কি অসতী ?"

সরস্বতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "অসতী ! লক্ষ্মী আমার সতী-শিরোমণি। লক্ষ্মী রমণীর আদর্শ ! তার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পিতৃপরিচয়ের কোন দরকার নাই—মাতৃ-পরিচয়ে, মাতৃ-মহিমায় আমার ঈশানী ইন্দ্রাণী অপেক্ষাও উচ্চ পদের দাবী করতে পারে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঠিক বলেছ সরস্বতী ! মা লক্ষ্মী, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তোমার ঈশানীকে আমি যার হাতে সমর্পণ করব, সে এই অমূল্য রত্নের আদর বুঝতে পারবে। তার কাছে ও-সব পরিচয় অতি তুচ্ছ ব'লে গণ্য হবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "তা হ'লে আমাকে এখন কি করতে বলেন ?"

সরস্বতী সে কথার উত্তরে বলিলেন, "আর কি কর্‌তে বলবেন,

দ্বাদশ-বৎসর ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল। এখন মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখে সংসার,কর ;—আমি বিদায় গ্রহণ করি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তা আর হয় না সরস্বতী! তোমাদের দুজনকেই আমি ছেড়ে দেব ; ঘর-সংসার করা অপেক্ষাও অনেক উচ্চ কাজ তোমাদের করতে হবে। সে আর একদিন বল্‌ব ; এখন আমাকে একবার ভুবনের বাড়ীতে যেতে হবে।" এই বলিয়াই সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

২০

সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাশীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ; ধনে মানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি কাশীর সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-সমাজের অন্যতম। পশ্চিম দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কাশীতে তিনপুরুষ বাস করিলেও দেশের সহিত তিনি সম্বন্ধ লোপ করেন নাই। দেশে তাঁহার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আছেন ; বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তিনি দেশে যান ; এবং সেখানেই সমস্ত কার্য্য করেন। তাঁহার পিতামহ কাশী-অঞ্চলে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই উপলক্ষেই তাঁহারা কাশীবাসী।

ভুবন বাবু সন্ন্যাসী মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি করেন। তাঁহারই নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী মহাশয়ও ভুবন বাবুকে বড়ই স্নেহ করেন। সন্ন্যাসীর উপদেশ ও আদেশ ব্যতীত তিনি কোন কাজই করেন না।

ভুবন বাবুর একমাত্র পুত্র যখন বালক, তখন হইতেই সন্ন্যাসী মহাশয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহার পর, সে যখন ইংরাজী স্কুলে বিদ্যারম্ভ করিল, তখন সন্ন্যাসী মহাশয়ই তাহার জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেও

সর্ব্বদা বিশ্বনাথের খবর লইতেন। বিগত ছয় বৎসর তিনি নিজেই বিশ্বনাথের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষাবিধানের গুণে বিশ্বনাথ একদিকে যেমন পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতেও কৃতিত্ব লাভ করিতে লাগিল ; সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর তাহার তেমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথকে ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে লইয়া যাইতেন এবং ঈশানীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত করিতেন। উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ যাহাতে স্থাপিত হয়, পরস্পর পরস্পরের গুণের অনুরাগী হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

ভুবন বাবু একমাত্র পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব গুরুদেবের নিকট একদিন উপস্থিত করায়, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন "ভুবন, যাহাকে আমি মানুষ করিতেছি, তাহার সকল ভার আমার উপর। তুমি ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক ; যথাকালে সে ব্যবস্থা করিব ; এখন তাহার শিক্ষালাভের বাধা জন্মাইও না।"

গুরুভক্ত ভুবন বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই কথায় সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইলেন ; গুরু যখন ভার গ্রহণ করিলেন, তখন আর কথা কি ?

পূর্ব্ব-অধ্যায়-বর্ণিত কথোপকথনের দিনই অপরাহ্ণ সময়ে সন্ন্যাসী ভুবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে

ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন, বিশ্বনাথের বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাকে সত্বরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাই।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "সে ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাই নিশ্চিন্ত আছি। আপনি যখন বিবাহ দিবার অনুমতি দিতেছেন, তখন আমরা ভাল মেয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই! আপনি দেখিয়া-শুনিয়া মত প্রকাশ করিলেই যত শীঘ্র হয় শুভকার্য্য সম্পন্ন করিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে অনুসন্ধানও তোমাকে করিতে হইবে না, আমি তাহাও করিয়াছি। এখন তুমি ও তোমার সহধর্ম্মিণী একবার মেয়েটী দেখ, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "দেখাশুনা বা পরিচয় যখন আপনি করিয়াছেন, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই হইল। আপনার আদেশই যথেষ্ট।"

এই সময় ভুবন বাবুর গৃহিণীও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "মা, বিশ্বনাথের বিবাহের পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাদের একবার দেখিতে যাইতে হইবে।"

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনি যখন দেখিয়াছেন, তখন আর আমরা কি দেখিব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তবুও দেখা কর্ত্তব্য।"

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কাহার কন্যা?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "আমারই আত্মীয়া।"

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনার আত্মীয়া। তাহা হইলে ঈশানী নামে যে মেয়েটীর প্রশংসা বিশ্বনাথ সর্ব্বদা করে, তাহারই কথা বলিতেছেন। সেই ত আপনার আত্মীয়া।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, সেই মেয়েই বটে। বিশ্বনাথের সহিত তাহার বিবাহ দিব বলিয়াই আমি তাহাকে তোমার পুত্রবধূ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছি।"

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "বিশ্বনাথের কাছে আমি মেয়েটীর প্রশংসা খুব শুনেছি। সে ত শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর কন্যা। সরস্বতী দেবী যে আমার বাপের বাড়ীর গ্রামের চাটুয্যেদের পুত্রবধূ। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় কাশীতে এসে বাস করছিলেন। তাঁর মত মায়ের মেয়ে যে ভাল হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। চাটুয্যেরা খুব বড় ঘর; বিষয়-সম্পত্তিও অনেক।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, এখানে তুমি একটু ভুল করলে। সরস্বতী ঈশানীর মা নয়; মেয়েটীকে লালন-পালন করবার ভার আমিই সরস্বতীর উপর দিয়েছিলাম; সকলেই জানে, এমন কি ঈশানীও জানে, সে সরস্বতীর মেয়ে।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "আমিও ঐ রকমই শুনেছিলাম।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "না ভুবন, ঈশানী সরস্বতীর মেয়ে নয়, লক্ষ্মীর মেয়ে!"

ভুবন বাবু বলিলেন, "বলেন কি প্রভু! লক্ষ্মী দেবীর মেয়ে! এ কথা ত জানতাম না। লক্ষ্মী দেবী ত মানুষ নন—সত্যসত্যই

দেবী; তাঁর নাম যে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে পড়েছে। যেখানে দুঃখ কষ্ট, যেখানে আপদ বিপদ, সেখানেই লক্ষ্মী! লক্ষ্মী এই আমাদের বাড়ীতেই কতদিন এসেছেন। লোকে বলে, তিনি শাপভ্রষ্টা। বিশেষ তিনি যখন আপনার শিষ্যা, তখন এ রকম যে হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! প্রভু, আপনি যে কি খেলাই খেল্‌ছেন!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঐ মেয়েটী পাছে লক্ষ্মীর যোগ-ধর্ম্মের অন্তরায় হয়, সেইজন্য মেয়েটী জন্মাবার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীকে আমার আশ্রমে নিয়ে যাই। তখন সে বড়ই অসুস্থ; আর সেই সময়ই সরস্বতীর উপর মেয়েটীর ভার দিই; নইলে ঐ মেয়ের মায়ায় বদ্ধ হলে, হয় ত লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী দেবী করতে পারতাম না।"

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ভুবন, মা লক্ষ্মীকে তোমরা জান, আমিও তাকে হাতে গড়ে তুলেছি; কিন্তু ঈশানীর পিতার কথা, তাহার পরিচয় তোমরা জান না। সে ইতিহাস শোন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর জীবনের আদ্যন্ত ঘটনা ধীরে-ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "শুনিলে, তোমার লক্ষ্মীর জীবন-কথা। লক্ষ্মী কাহারও বিবাহিতা পত্নী নহে। অসহায়া কুমারী দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলেই এই কন্যা। সেই আক্রমণের মুহূর্ত্তের পর হইতেই লক্ষ্মী বিধবা। বিবাহ না হউক, ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান অবস্থায় সে একজনের কাম-পত্নী হইয়াছিল; তাহার পরক্ষণ হইতেই সেই দুর্ব্বৃত্ত লক্ষ্মীর পক্ষে মৃত। এই অজ্ঞাত-জনক কন্যার

সহিত, প্রকৃত ব্রহ্মতেজগর্ব্বিতা দেবীর গর্ভজাতা কুমারীর সহিত আমি তোমাদের বিশ্বনাথের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভুবন, মনে করিয়া দেখ, তোমার পুত্রের নামকরণের কথা। আমিই তাহার বিশ্বনাথ নামকরণ করিয়াছিলাম। আজ সেই নাম সার্থক করিতে যাইতেছি। যে বিশ্বনাথ, সে ঈশানীকে গ্রহণ করিবে না কেন? বিশ্বনাথ গ্রহণ করিবে, তাহা আমি জানি; আর তোমরাও যে তোমাদের সেই পুতিগন্ধময় সমাজ-শাসন না মানিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবে,তাহা আমি জানি। এই আজই লক্ষ্মীকে যখন এই কথা বলিলাম, তখন সে তোমাদের হইয়াই সমাজের কথা তুলিয়াছিল। আমি তাহার কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছি, সে কথা কতদিন,কত প্রকারে তোমাকে বলিয়াছি ভুবন! যে সমাজ মিথ্যা, কপটতা, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রদান করে, যে সমাজ পাপ গোপন করিবার জন্য কত গর্হিত উপায় অবলম্বন করে,যে সমাজের কলঙ্ক-কালিমায় বিশ্বনাথের এই পবিত্র কাশীধাম প্রতিদিন মসীময় হইতেছে, যে সমাজ মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে ভ্রূণহত্যা করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই সমাজের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিবে না;—সে সমাজ যাইতে বসিয়াছে। তার স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে আর এক ব্রাহ্মণ-সমাজ;—আসিয়া পড়িয়াছে ভুবন! তোমরা সেই সমাজের অগ্রণী! তোমরা মিথ্যা, কপট আচরণ করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে বল যে, লক্ষ্মীর কন্যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবে, কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না। যাহারা এখনও পুতিগন্ধময় সমাজের শব বুকে করিয়া, চক্ষু

মুদিয়া পড়িয়া আছে, তাহারা তোমার প্রতিকূলতা করিবে; কিন্তু এই কাশীধামে যাঁহারা মহাপণ্ডিত, যাঁহারা হৃদয়বান, যাঁহারা ভবিষ্যৎ পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকামী, তাঁহারা সানন্দে তোমাকে অভিবাদন করিবেন। আমি অনেকের সহিত তর্ক করিয়াছি, বাদানুবাদ করিয়াছি। যাঁহারা প্রকৃত মানুষ, তাঁহারা আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আর যাঁহারা সুধু পুথি লইয়াই আছেন, আচারের গণ্ডীর মধ্যেই অন্ধভাবে ঘুরিতেছেন, চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছেন না, তাঁহারা বলিয়াছেন 'তাই ত, সে কি করিয়া হইতে পারে'। তাহাদের দেখাইতে হইবে, এই করিয়া হইতে পারে,—এই দেখ হইল। মনে করিও না ভুবন, মনে করিও না মা; তোমরা জাতিচ্যুত হইবে,—তোমরা একঘরে হইবে। সে দিন আর নাই মা! এক দল তোমাদিগের সহিত হয় ত কিছুদিনের জন্য আহার বন্ধ করিবেন, হয় ত তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ-কেহ তোমাদের সহিত যোগদান করিতে কয়েকদিন কুণ্ঠিত হইবেন; কিন্তু দেখিও, সত্যনিষ্ঠ, নববলদৃপ্ত, সুস্থ, সবল ব্রাহ্মণ-সমাজ তোমার সহিত যোগদান করিবে। তাহারা সংখ্যায় কম নহে,—তাহারাই ভবিষ্যত ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা, তাহারাই পবিত্র আর্য্য ব্রাহ্মণ-সমাজের বীর। কেমন ভুবন, কেমন মা, এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে? দেখ, তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, এ কার্য্য অশাস্ত্রীয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশ শাস্ত্রের মিথ্যা সংস্করণ দ্বারা শাসিত হইতেছে; আমাদের সমাজ এখন শাস্ত্রকে দূরে ফেলিয়া দিয়া, দেশাচারের কঠিন নিগড় পায়ে পরিয়াছে।

এ সমাজের কথা বলিব না; কিন্তু সনাতন আর্য্য-সমাজ, আমাদের পূজনীয় মুনিঋষিগণের সমাজ এ সম্বন্ধে,ঠিক এই ঈশানীরই অনুরূপ একটী ঘটনা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, শুনিবে? ভুবন, তুমি কি মহাভারতে সত্যকাম-জবালার কথা পড় নাই। মা, শোন সেই উপাখ্যান। জবালার পুত্র—একমাত্র সন্তান সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আশায় শিষ্যত্ব করিবার জন্য গিয়াছিল। ঋষি তাহার নাম-ধাম, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সত্যকাম বলিল 'ঠাকুর আর কোন পরিচয় জানি না; এইমাত্র জানি, আমি আমার মা জবালার পুত্র।' এই কথা শুনিয়া গৌতম ঋষি বলিলেন 'বৎস,আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যতীত অন্য কাহাকেও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি না। তুমি তোমার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তোমার পিতার নাম-গোত্র কি?' সত্যকাম তখন মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। এই কথা শুনিয়া জবালা অম্লান-বদনে, অসঙ্কুচিত-চিত্তে, বলিলেন, 'বাছা, ঋষিপ্রবরকে বলিও, আমি যৌবনকালে বড় দরিদ্রা ছিলাম। সেই সময় অনেকের উপাসনা করিয়াছি; সুতরাং কে তোমার পিতা; তাহা ত আমি বলিতে পারিব না।' সত্যকাম তখন গৌতম ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'প্রভু, মা বলিলেন, তিনি যৌবনে অনেকের উপাসনা করিয়াছেন; সুতরাং আমার পিতা কে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।' এই কথা শুনিয়া গৌতম কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিবে কি? সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সে কথা বলিব না; তোমাদেরই একজন

কবি গৌতম ঋষির সেই অমৃতময়ী বাণীর যে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তাহাই তোমাদিগকে বলি—

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন,—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত!"

বুঝিলে কি ভুবন, বুঝিলে কি মা, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? জবালা স্বেচ্ছায় অনেকের পরিচর্য্যা করিয়াছিল; সে স্পষ্ট বলিয়াছিল—

"বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।"

অসঙ্কুচিত-চিত্তে নিজের স্বেচ্ছাকৃত পাপের কথা প্রকাশ করিবার মহত্ত্ব জবালার ছিল; তাই গৌতম ঋষি সেই সত্যনিষ্ঠাবতী মায়ের পুত্রকে অনায়াসে দ্বিজোত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন,—তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন। এখন ভুবন, আমার লক্ষ্মীর কথা ভাব দেখি। সে কাহাকেও আত্মদান করে নাই। অসহায়া কুমারীকে গভীর অন্ধকার রজনীতে দুর্ব্বৃত্তেরা বলপ্রকাশে লইয়া গেল; তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিল। তখন সে অজ্ঞান—তখন তাহার বাধা দিবার শক্তি ছিল না। সেই অত্যাচারের

ফলে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। তাহার আত্মীয়-স্বজন ভ্রূণহত্যা করিতে বলিল। সে তাহা করিল না,—সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেছিল, সে অসতী নহে। এ কি তাহার মিথ্যা ধারণা ভুবন? তারপর এই পাপের কার্য্য অতিক্রম করিবার জন্য লক্ষ্মী চির নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিল,—সকলের আশ্রয় ত্যাগ করিল—ভিখারিণী হইবার সঙ্কল্প করিল। তাহার পর যাহা হইয়াছে, সে সবই তুমি জান; সকলই তুমি শুনিয়াছ। এখন তুমিই বল ভুবন, তুমিই বল মা, আমার ঈশানীকে কি তুমি ব্রাহ্মণী-কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে একটুও দ্বিধা করিতে পার? সত্যকামকে গৌতম ঋষি দ্বিজোত্তম বলিয়াছিলেন;—কেন? তাহার মাতা সত্যবাদিনী—সত্যকাম সত্যকুল-জাত। আমি বলিতেছি,, দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, সে তুলনায় আমার ঈশানী সহস্রগুণে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মীর কন্যাকে এ নামে অভিহিত করিতে কেহই সঙ্কুচিত হইতে পারে না। এ সব কথা না ভাবিয়া আমি আমার পরম স্নেহাস্পদ বিশ্বনাথকে ঈশানীর সঙ্গে উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতাম না। ইহাই প্রকৃত হিন্দুত্ব—ইহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব! এই মহত্ত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। সেই জন্যই আমার এই প্রয়াস! এখন বল মা, এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে? সর্ব্বান্তঃকরণে আমার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিবে? ভুলিয়া যাও, আমি তোমাদের গুরু;—ভুলিয়া যাও, আমি তোমাদের এ আদেশ করিতেছি। মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সনা-

তন আর্য্য-ধর্ম্মের মহিমার দিকে চাহিয়া বল তোমরা, এ কার্য্য করিতে পারিবে কি না?”

ভুবন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “হাঁ পারিব, নতুবা আপনার শিষ্য হইবার আমরা অযোগ্য।”

এই সময় রমেশ সেখানে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ভুবন বাবু বলিলেন “এই যে রমেশ! এস, এস।”

রমেশ সহাস্য মুখে বলিল, “আমি খালি হাতে আসিনি, কুটুম্ববাড়ীতে কি অমনি আসে, তত্ত্ব এনেছি।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “কৈ তোমার তত্ত্ব রমেশ!”

রমেশ বলিল, “নীচে আছে। রমেশ কি আর এখন হেঁটে চলে, গাড়ী করে এসেছে। হুকুম হয় ত তত্ত্ব নিয়ে আসি।”

এই বলিয়া আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই রমেশ নীচে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই পুনরায় উপস্থিত হইল—সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও ঈশানী।

রমেশ বলিল, “এই নিন আপনাদের তত্ত্ব। আজ বার বছর ধরে বুড়ো এই তত্ত্ব গুছিয়ে আসছে; আজ কুটুম্ববাড়ী পৌঁছে দিয়ে রমেশের ছুটী। ওরে বেটারা, কৈ রে, শাঁখ বাজা!”

ভুবন বাবুর সহধর্ম্মিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঈশানীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন “এস, এস মা, আমার ঘরের কল্যাণী এস! আমার অন্নপূর্ণা এস মা!”

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে শাঁখ বাজা রে, শাঁখ বাজা।"

ভুবন বাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "রমেশ, তোমার এই আনন্দধ্বনি শাঁখের ধ্বনি অপেক্ষাও পবিত্র।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, আমার সকল আশা পূর্ণ হয়েছে। ঈশানী, এঁদের প্রণাম কর।"

২১

সেই দিনই সকলের সম্মুখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ভুবন বাবু তখনই ঈশানীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বনাথকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় কথা উঠিল, কে আশীর্ব্বাদ করিবে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তুমিই বিশ্বনাথকে আশীর্ব্বাদ কর।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমি! আমি কে? আমি ত কেউ নই প্রভু! আমি মেয়েকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম; তার পর থেকে ত ঈশানীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। আমি নিতান্ত অপরিচিতার মত কখন কোন দিন ওকে দেখ্‌তে গিয়েছি মাত্র। আজকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঈশানীই জান্‌তে পারে নাই যে, আমি তার গর্ভধারিণী। যে তাকে মানুষ করেছে, যে তার মায়ের কাজ করেছে, সেই আশীর্ব্বাদ করবে; আমি সুধু দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব।"

সরস্বতী বলিলেন, "ব্যাপার হোল ভাল। মেয়ের বাপ পাওয়া গেল না, মা-ও দেখ্‌ছি ঝেড়ে ফেল্‌তে চান। তা বেশ কথা। আমাদের কাউকেই আশীর্ব্বাদ করে কাজ নেই; আমি

বলি কি, রমেশ দাদা বিশ্বনাথকে আশীর্ব্বাদ করবে ; রমেশ দাদাই এ বিবাহের কন্যাকর্ত্তা।”

রমেশ বলিল, “ঠাকুর মশাই, শুন্‌লেন এদের কথা। আমি রমেশ জানা পৃথিবীর কারো আত্মীয় নই ; কারও সংসারের কোন ধার ধারি নে। এই লক্ষ্মী সরস্বতী দুইটাতে মিলে আমাকে এই বারটা বছর ভূতের ব্যাগার খাটিয়ে নিল। তার পর এখন বলে কি না, আশীর্ব্বাদ কর। তার পর বলে বস্‌বে, এদের ঘর-সংসার বেঁধে দেও। না, দিদিমণিরা, রমেশ জানা আর ফাঁদে পা দিচ্ছেন না। এই বারটা বছর, বুঝলেন ভুবন বাবু, এই বারটা বছর ঐ ক্ষুদে মেয়েটা আমার সব ওলটপালট করে দিয়েছে। দিদি লক্ষ্মী ত চলেই গেলেন ; ধরা পড়লেন ঐ সরস্বতী ঠাকরুণ, আর ধরা পড়লেন এই রমেশ জানা ! ওঁর ধর্ম্মকর্ম্ম উড়ে গেল, জপ-তপ চলে গেল—সুধু ঈশানী, আর ঈশানী। আর আমার কথা কি বল্‌ব ; আমি এই কাশীতে পঞ্চাশ বছর বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি ; যা খুসী তাই করেছি ; কোন ভাবনা-চিন্তে ছিল না। কাশীশ্বর বল্‌লেন, রও রমেশ জানা, তোমায় মজা দেখাচ্ছি। দেখুন না ঠাকুর মশাই, কোথাকার বাঙ্গাল দেশের এক মেয়ে এসে পড়বি না পড়বি এই রমেশ জানার কাঁধের উপর। কেন রে বাপু, কাশীতে কি আর মানুষ ছিল না ! তার পর দেখুন, এই বারটা বছর রমেশ জানা আর আগেকার সে রমেশ ছিল না। এমন বাঁধনেও বাঁধতে হয় ঠাকুর মশাই ! এ সব ত আপনারই কাজ। আমি স্পষ্ট বল্‌ছি দিদি লক্ষ্মী-

সরস্বতী তোমাদের মায়ায় আমি আর ভুল্‌ছিনে। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদের মধ্যে নেই।

ঈশানী এতক্ষণ সরস্বতীর পার্শ্বে বসিয়া ছিল; এই সময় সে হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া রমেশের কোলের কাছে বসিল।

রমেশ অমনি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওরে সর্ব্বনাশী, অমন করে তুই আমায় জড়িয়ে ধরিস্‌নে। দেখুন দেখি ঠাকুর মশাই, আমি চাচ্ছি ওকে ঝেড়ে ফেল্‌তে, আর ও কিনা আমারই কোলের কাছে এসে বস্‌বে—আমাকে শত বাঁধনে জড়াবে। ওরে রাক্ষুসী, তুই কি রমেশকে পালাতে দিবি নে। দেখছেন ঠাকুরমশাই, মেয়েটার হাসি! ওই হাসিতেই ত আমার সব ভুলিয়ে দেয়। আজ বার বছর আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। হাস, হাস, মা আমার, খুব হাস! আমি ঐ হাসি দেখতে দেখতেই যেন মরি। যাক্, বেশ বুঝলাম, রমেশ এখন তার সব ঐ মেয়েটার কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কোন কথা বল্‌ব না। দাও না গো, কি দিয়ে বাবা বিশ্বনাথকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে, দাও। দিদি লক্ষ্মী, সরস্বতী, তোমরা পথ পেয়েছ; তোমরা তোমাদের পথে যাও। আমার পথ এই ঈশানী-বিশ্বনাথ।

সন্ন্যাসী তখন একটী বেলের পাতা রমেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "রমেশ, বাবা বিশ্বনাথ বেলের পাতাতেই সন্তুষ্ট। তুমি তাই দিয়েই আশীর্ব্বাদ কর।"

রমেশ তখন সেই বেলের পাতা দিয়া বিশ্বনাথকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “জয় বিশ্বনাথজিকি জয়! জয় ঈশানী-বিশ্বনাথকি জয়!”

সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমরা এখন হইতেই বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও। আমি আশ্রমে যাই, বিবাহের দিন যথাসময়ে উপস্থিত হব।”

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আপনি কি এখন একবার আমাদের সঙ্গে যেতে পার্‌বেন না?” লক্ষ্মীর স্বর মিনতি-পূর্ণ।

সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার মুখ বড়ই বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট। তিনি বলিলেন, “কেন মা! তোমার কোন প্রয়োজন আছে? তোমার মুখখানি বড়ই মলিন দেখাচ্ছে।”

লক্ষ্মী বলিল, “আপনি দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন।”

সন্ন্যাসী এই কাতর অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন।

বাসায় পৌছিবার পর লক্ষ্মী বলিল, “প্রভু, আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলাম। কিন্তু উপায় নাই। আপনি এই দ্বাদশ বৎসর আমাকে যাহা শিখাইয়াছেন, আজ এক মুহূর্ত্তে সে সব ভুলিয়া যাইতে বসিলাম প্রভু!” এই বলিয়া লক্ষ্মী নীরব হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা লক্ষ্মী, তোমার কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

লক্ষ্মী বলিল, "প্রভু, এই দ্বাদশ বৎসর আমি সমস্তই ভুলিয়াছিলাম। ঈশানীকে মধ্যে-মধ্যে দেখিতে আসিয়াছি ; কিন্তু আপনার কৃপায়, আপনার শিক্ষার গুণে, আপনি যে সকল কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বে ও মহত্বে আমার গর্ভজাতা সন্তানও আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি মায়া-মোহ জয় করিয়াছি ; দশের সেবা ব্যতীত আমার জীবনে আর কোন কাজ নাই। কিন্তু প্রভু, আজ আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে! ভুবন বাবুর বাড়ীতে বসিয়া যখন আমি ঈশানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া কথা বলিলাম, তাহার পর মুহূর্ত্তেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। আমি তখন ঈশানীর দিকে চাহিলাম। প্রভু, এমন ভাবে ত মেয়ের দিকে আমি কোন দিন চাহি নাই। সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল, আমি ঈশানীর জননী ;—আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সে যে আমারই বুক-চেরা ধন। আমার বুকের ভিতর তখন কেমন করিয়া উঠিল। যে মাতৃত্ব হইতে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া আমি এতকাল কাটাইয়াছি, তাহা নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ঈশানীকে আমি বুকে চাপিয়া ধরি,—তারস্বরে বলি —ওরে তুই আমার সন্তান! তুই আমার! যে স্নেহ-মমতাকে আপনি বিশ্বময় সম্প্রসারিত করিবার জন্য এত শিক্ষা দিলেন, তাহা যে আমার থাকে না। এ কি করিলেন প্রভু!"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে লক্ষ্মীর কথা শুনিতেছিলেন। লক্ষ্মী যখন

নীরব হইল, তখন বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, আজ আমার পরাজয়। আমি মানব-চিত্তের রহস্য এতকাল বুঝিতে পারি নাই;—মাতৃত্বের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম, কেন তোমরা বিশ্বজননী!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই শ্রেষ্ঠ পথ;—তোমাকে সেই পথেই যাইতে হইবে। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি তোমাকে অগ্রসর করিয়াছিলাম। ঈশানীর মধ্য দিয়াই তোমাকে জগতে সম্প্রসারিত করা কর্ত্তব্য ছিল। বেশ, তাহাই হইবে। তুমি এখানেই থাক লক্ষ্মী! ঈশানী আজ হইতে তোমার কন্যা। তাহার পর যাহা করিতে হয়, পরে হইবে। মা জগদম্বা, তোমার খেলার আর একটা দিক আজ দেখিলাম—শিখিলাম।" তাহার পর সরস্বতী ও রমেশকে বলিলেন, "দেখ সরস্বতী, ঈশানীর বিবাহের যথাযোগ্য আয়োজন কর। তোমার যাহা কিছু অর্থ আছে, এই বিবাহে সমস্ত ব্যয় করিয়া তোমাকে একেবারে কপর্দ্দক-শূন্য হইতে হইবে। রমেশ, তোমার উপর সমস্ত আয়োজনের ভার দিলাম। ঈশানীর বিবাহ হইয়া গেলে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব; তোমরা সে চিন্তা করিও না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন লক্ষ্মী বলিল, "প্রভু আর একটা কথা।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "কি কথা মা! তোমার কাকা হরেকৃষ্ণের সন্ধান লইবার কথা ত। তাহাকে আনিবার জন্যই

আমি আজ বঙ্গদেশে যাত্রা করিব। তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে এই উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া আসিব। এই ত তোমার কথা মা!”

লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিল।

* * * *

শুভদিনে বিশ্বনাথের সহিত ঈশানীর বিবাহ হইল। কন্যা সম্প্রদান করিলেন লক্ষ্মীর কাকা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভুবনবাবু একমাত্র পুত্রের বিবাহে সমারোহের ত্রুটী করেন নাই। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণেরও দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না। ভুবন বাবু তাহাতে ভীত বা দুঃখিত হইলেন না, কারণ এ ব্যাপারে মতভেদ বর্ত্তমান সময়ে হইবেই, তাহা তিনি জানিতেন। এদিকে সরস্বতী দেবীও আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই; তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই তিনি এই ব্যাপারে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। কাশী সহরময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

বিবাহের আনুষঙ্গিক কার্য্যকলাপ শেষ হইয়া গেল। এখন এই দৃশ্যের অভিনেতৃবর্গের বিদায়ের পালা।

সন্ন্যাসী একদিন সকলকে সমবেত করিয়া বলিলেন, “বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় ঈশানীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এখন তোমাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। তোমরা কে কি করিতে চাও, অম্লান-বদনে আমার নিকট খুলিয়া বল।”

সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আপনি যাহার সম্বন্ধে যে পথ নির্দ্দেশ করিবেন, আমরা তাহাই অবলম্বন করিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা সরস্বতী, তুমি আমার আশ্রমে চল। লক্ষ্মীকে দিয়া আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবার ভার আপাততঃ তোমাকে একাকিনীই বহন করিতে হইবে। রমেশ, তোমাকেও আমার আশ্রমে যাইতে হইবে। তোমার সকল কার্য্য শেষ হইয়াছে;—এখন তোমার কয়েকদিন বিশ্রাম—একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আর মা লক্ষ্মী, তোমাকে এখন সংসারধর্ম্ম করিতে হইবে। তোমাকে এই দ্বাদশ বৎসর যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা নিষ্ফল হইবে না; কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন ঈশানীকে লইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তাহার পর যথাসময়ে তোমাকে আমি ডাকিয়া লইব। তোমার সম্বন্ধে আমি যে একটু ভ্রম করিয়াছিলাম, এই তাহার সংশোধন করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, অচিরেই লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একই ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব। ঈশানী, তোমাকে আর কি বলিব? তুমি বিশ্বনাথের সহধর্ম্মিণী—তুমি ঈশানী! মনে রাখিও—লক্ষ্মী তোমার জননী—সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপিণী সরস্বতী তোমার পালয়িত্রী;—সর্ব্বশেষ মনে রাখিও,—তুমি বিশ্বনাথের

ঈশানী।